+

জয় দয়াময়

শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ

শ্রী লব চন্দ্র পাল প্রণীত

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

প্রকাশনায় :
প্রকাশনা কমিটি
সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশ।

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন কর্তৃক সর্ব্ব সত্ব সংরক্ষিত।

তৃতীয় সংস্ককরণ
আনন্দাব্দ- **১৯১**
৫ পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২১ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ

ভূমিকা

আমার কথা

আমি আজ অনেক দিন হইল দয়াময় নাম গ্রহন করিয়াছি। এই নাম যিনি আমাকে দেন তাঁহাকে দেখিয়াছি। আমি তখন উচ্চ ইংরেজি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র– নবীনগর স্কুলে পড়িতাম। একখানা চিঠিতে একদিন সকল দুঃখের কথা লিখিয়া শ্রীশ্রী মত্ আনন্দস্বামী মহারাজের কৃপা প্রার্থী হই। তিনি আমাকে উত্তরে আমার জীবনের আশা মূলক ভবিষ্যত্ বুঝিতে দেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি নামও জপ করিতে লিখেন। ইহাই আমার প্রথম গুরুকরণ। ইনিই আমার গুরু এবং জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এই ঘটনা বোধ হয় ১৩০৫ বাং সনের কথা। তারপর ১৩০৬ বাং সনের আশ্বিনে (যতদূর মনে পড়ে) স্বামীজী আমাদের নিজ গ্রামে আসেন। আমি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরার বাড়ীতে থাকিতাম; এই বাড়ীতেই তিনি পদার্পণ করেন। বিকালে তাঁহাকে ইব্রাহিমপুর গ্রামের শ্রদ্ধেয় ঁ উদয় সরকারের বাড়ী হতে পালকী নিয়া আনিতে গিয়াছিলাম। তিনি চৌকির উপর উপবিষ্ট ছিলেন। বিছানার চাদর খানা খুব সুন্দর ছিল। তিনি পরমোজ্জ্বল সোনার কান্তিতে আমার চক্ষুতে ঝলসীতে ছিলেন, আমি স্বর্গের সৌন্দর্যে যেন মোহিত ও দণ্ডায়মান ছিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার পবিত্র পদধূলী গ্রহন করিতে দিয়াছিলেন। আমার সৌভাগ্য যে সেই স্মৃতি বুকে নিয়া তাঁহার পবিত্র জীবন কাহিনী, তাঁহার মুখের উপদেশ ও ধর্ম্ম এই গ্রন্থে নিবদ্ধ করিতে বসিলাম। তিনি আমার সহায় হউন, তাঁহার নামের জয় হউক এবং তিনি যে নামের প্রতিষ্ঠাকল্পে আসিয়াছিলেন সেই নামেরও জয় হউক।

স্বামীজীর জীবনের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। কেহ এ জীবনী সংগ্রহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করেন নাই।

সুতরাং তাঁহার তিরোধান হইলে পর তাঁহার সম্বন্ধে কোন কাহিনী কেহই যথাযথ ভাবে বলিতে পারিতেছেন না। অনেকে আমায় যাহা বলেন, উহাতে আগপর সামঞ্জস্য থাকে না; কেহ শুধু তাঁহার অলৌকিক কার্য্যাবলীই বর্ণনা করেন। এই ভাবে অনেকের কাছে গিয়া তাঁহার জীবন বৃত্তান্তের কিছুই উদ্ধার করিতে পারি নাই, বরং যে সকল সরল প্রাণ ভক্ত তাঁহারি আশ্রয়ে জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন তাহাদের মুখের এলোমেলো কথাতে ইতস্তত হইয়া পড়িয়াছি। তথাপি তাঁহার স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থরাজি বা তৎপুত্র ভক্তি ভাজন শ্রীমত মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের লিখিত 'প্রকৃত তত্ত্বের' ভূমিকা ও শ্রীমত মনোমোহন দত্ত মহোদয় কর্তৃক মদীয় গুরু লিখিত বিবরণী প্রভৃতির সমালোচনা দ্বারা দুই তিনবার এই জীবনী লিখিতে চেষ্টাও করিয়াছি– সফল কাম হই নাই। শেষে বর্তমান কার্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্যে প্রত্যাদেশ শুনিলাম। ইহাই এ গ্রন্থের প্রকৃত ভূমিকা বলিতে হইবে। আজ থেকে এই পুস্তকের লেখা আমার নিকটে যে ভাবে প্রকাশিত হইবে, সে ভাবেই আমি ইহা লিখিয়া যাইব। ইহার ভাব ও ভাষা কিংবা ইহার সম্বন্ধে সকল কথা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রেরণা ও বাণী মূলক হইবে। আমি কেবল তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক হইয়া কার্য্য করিব। আমি আর কিছুই বলিতে যাইব না, যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেন তিনিই ইহার পর্য্যবসান করিবেন।

শ্রীমত্ স্বামীজীকে দেখিয়াছি, তাঁহার মুখে দু' চারটি উপদেশ শুনিয়াছি; তিনি আমাকে নাম লিখিয়া নিতে বলিয়াছিলেন এবং আমিও তাঁহার কথানুসারে নাম লিখিয়াছিলাম। আজ কতদিন গিয়াছে, তাঁহার পদানুসরণ করিতেছি, তাঁহাকে পাই না। তিনি সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন ও মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে ধর্ম্মগ্রন্থে স্বীয় মত সুন্দর সরলভাবে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার নামে অসংখ্য মানুষের প্রাণে ধর্ম্মের ভাব জাগিতেছে– তিনি আদর্শ বলিয়া পূজিত হইতেছেন।

আমাদের মধ্যে তিনিই কার্য্য করিতেছেন ও আমাদের পথের সম্বন্ধে তাঁহারই উপদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তাঁহার উপদেশানুরূপ জীবন গঠন করিতে পারিলাম না। তাঁহার সাধনায় তিনি সমস্ত জগতের মুক্তি খুঁজিতেন– তিনি সকলের শান্তির জন্য সাধন করিতেন। এজন্যে আশা করি আমরাও তাঁহারি কৃপাতে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম্মের বল সংগ্রহে সফল কাম হইতে পারিব এবং তিনি আমাদের অন্তরে আজন্ম সুহৃদের ন্যায় শক্তি সঞ্চার করিবেন।

নিবেদক–

শ্রীমৎ লবচন্দ্র পাল গুরুমহারাজ

ভূমিকা

ভক্তিভাজন গ্রন্থকর্ত্তা অনেক দিন পূর্ব্বে সর্ব্ব ধর্ম্মাবতার শ্রীশ্রী আনন্দ মহারাজের জীবন চরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কালক্রমে তিনি মহারাজের জীবন ধারার আরও অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বুঝিতে পারিলেন এই জীবন চরিতখানা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে মহারাজের আর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার পূর্ব রচিত জীবন চরিতখানা বাতিল বা নষ্ট করিয়া ফেলেন। পরবর্ত্তী কালে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীশ্রী আচার্য্য মহারাজের যে জীবন চরিত রচনা করিয়াছিলেন তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত সংগোপনে রাখেন। তাঁহার লীলা সম্বরণের পর আমরা এই অমূল্য গ্রন্থের সন্ধান পাই। এক্ষণে সহৃদয় ধর্ম্ম বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহা মিশন হইতে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীশ্রী আচার্য্য মহারাজ সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনি পঞ্চ নামে অভিহিত, যথা–

১। শ্রী আনন্দ

২। শ্রীশ্রী আচার্য্য মহারাজ

৩। শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামী

৪। মহারাজ

৫। দয়াময়

শ্রী আনন্দ বলিতেন–"আমার জ্ঞান অনন্ত, বিশ্বাস পর্ব্বতের ন্যায় অটল, অচল।" জগতকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি কঠোর সাধনা করিয়া যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন 'দয়াময়' নামই তাহার মূলমন্ত্র। তিনি বলিয়াছেন দয়াময় নামেতে সকল নামের যোগ আছে। এই নামেতেই জগতের সকল জাতি এক যোগে কার্য্য করিয়া জীবন মুক্তি লাভ করিবে– ইহলোক ও পরলোকবাসী মানব ও দেবতা সকল পার্থক্য ভুলিয়া মধুর নাম রসে পরমানন্দ লাভ করিবে।

শ্রীশ্রী আচার্য্য মহারাজ সর্ব্ব তত্ত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার এই দেবদুর্ল্লভ জীবন চরিত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, তিনি কি উদ্দেশ্যে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া জগতকে এক অভিনব রাজ্যের সন্ধান দিয়া যান।

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
১৪০০ বাংলা

বিনয়াবনতঃ-
শ্রী কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়– নন্দী বংশ	--------	০১
দ্বিতীয় অধ্যায়– জন্ম, শিক্ষা ও সংসার	--------	০৮
তৃতীয় অধ্যায়– ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ ও সর্ব্ব ধর্ম্মের আবির্ভাব	--------	১৩
চতুর্থ অধ্যায়– কার্য্য প্রণালী	--------	২৮
পঞ্চম অধ্যায়– শিষ্যদের কথা	--------	৪৬
ষষ্ঠ অধ্যায়– সর্ব্ব ধর্ম্ম তত্ত্ব	--------	৫৮
সপ্তম অধ্যায়– উপাসনার প্রণালী	--------	৬৯
অষ্টম অধ্যায়– সাধন প্রণালী	--------	৯২
নবম অধ্যায়– সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল কথা	--------	১০২
দশম অধ্যায়– সর্ব্ব ধর্ম্মের বিশেষ কথা	--------	১০৮
একাদশ অধ্যায়– এ ধর্ম্মে কোন জাতীয়তা নাই	--------	১১৫
দ্বাদশ অধ্যায়– শেষ কথা বা শান্তির সাধনা	--------	১১৯
শ্রী আনন্দের বাণী	--------	১২৪

প্রথম অধ্যায়

নন্দী বংশ

নন্দী বংশের ইতিহাস কালীকচ্ছ গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ। কালীকচ্ছ, কুমিল্লা জেলার অতিশয় বিখ্যাত গ্রাম। ইহার জনসংখ্যা খুব বেশী এবং অনেক জাতির বাসস্থল বলিয়াই লোকবল বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মহীধর নন্দী পশ্চিম বাংলার বর্দ্ধমান জিলায় পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কুমিল্লা জেলার কালীকচ্ছ গ্রামে আবাস ভূমি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কালীকচ্ছ গ্রাম ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে উত্তরাভিমুখে ৮/৯ মাইল হইবে। ঐ গ্রামে উচ্চ শিক্ষিত লোক অনেক ছিলেন। রাজ কর্ম্মচারীদের সংখ্যাই ঐ গ্রামের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে। প্রসিদ্ধ কাওলাত, জমিদার, স্থানীয় বিচারক আর লেখকের সুনাম প্রচারিত হইয়াছে এমন খবরও জানা গিয়াছে। প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত দ্বিজ দাস দত্ত মহাশয় সর্ব্ব প্রথম কৃষি বিদ্যায় অধ্যয়নার্থে ইংল্যাণ্ডে গিয়াছিলেন। আবার গ্রামে সাধন ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ইদৃশ মহাপুরুষের নামও শুনিয়াছি। সুতরাং বলিতে গেলে সংসারের হিসাবে যেমন ধর্ম্মের হিসাবেও তেমনি কালীকচ্ছের যশ চারিদিকে না আছে এমন নহে।

রাজীন্দ্র নারায়ণ নন্দীই কালীকচ্ছে নন্দী বংশে পরবর্তী সময়ের বিখ্যাত পুরুষ। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনিই একটি প্রকাণ্ড দিঘী খনন ও একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশীয়েরা বিখ্যাত মৌলিক কায়স্থ। তাঁহারা বহুকাল যাবত প্রভূত প্রতিপত্তি সহকারে কালীকচ্ছে বাস করিয়া আসিতেছেন। রাজীন্দ্র নারায়ণের দিঘীর দুই পাড়ে তাঁহার দুই পুত্রের বাড়ী ছিল। পূর্ব্ব পাড়ে শিব প্রসাদ নন্দী বাস করিতেন। তাঁহার অপর পুত্র গণপতি নন্দী দিঘীর পশ্চিম পাড়ে বাস করিতেন।

কালীকচ্ছের বর্ত্তমান নন্দী বংশীয়েরা গণপতি নন্দীরই বংশধর। শ্যাম-রাম নন্দী গণপতি নন্দীর বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি একজন সাধু মহাত্মা ছিলেন। এই বংশেই শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য আনন্দ চন্দ্র নন্দী মহারাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাংলা ১২৩৯ সালের ১১ বৈশাখ রবিবার দিবসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দেওয়ান রাম দুলাল নন্দী জগন্মাতা কালীর উপাসক ছিলেন। রাম দুলালের বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম হইতে না হইতেই তাঁহার পিতা শ্যামরাম নন্দী পরলোকে চলিয়া যান। এত অল্প বয়সেই সংসারের গুরুভার তাঁহার উপর নিপতিত হইল। তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও পার্শি পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম সঙ্গীত সকল এখনও প্রাচীন সঙ্গীত বিশারদ ব্যক্তিগণ গাহিয়া থাকেন। কালীভক্তগণ তাঁহার মালসী গান করিয়া আজও আনন্দ উপভোগ করেন। এস্থলে একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হইল।

সঙ্গীত–

রাগিণী মালশ্রী

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি,
যে তোমায় যেমনি ভাবে, তাতে তুমি হও মা রাজি।
মগে ব'লে ফারা তারা, গড বলে ফিরিঙ্গি যারা,
খোদা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি,
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি,
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষে বলে তুমি ধনেশ,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরাম দুলালে বলে, বাজি নয় এ যেন ফলে,
এক ব্রহ্ম পৃথক ভেবে মন আমার হয়েছে পাঁজি।

সাধক রাম দুলালকে বাস্তবিক গৃহী বলিলে সত্য পরিচয় হইবে না। তিনি হৃদয়ের অন্তরালে শ্যামা মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিত্য বিচরণ করিতেন। দুলাল রাজার অধীনে কার্য্য করিয়া অতুল সম্পদ লাভ করেন। বহু অর্থ ব্যয়ে একটি পাকা বসত বাটী তৈয়ার করেন। পুকুর, চত্বর, উদ্যান সকল প্রকারের উন্নত পরিবারোচিত সুবিধা তাঁহার ছিল। রাজার দেওয়ান রাম দুলাল মুন্সী কত উল্লাসে বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। ইষ্টদেব একদা ঐ বাটী দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দুলাল, বাড়ীখানা বেশ হইয়াছে; বড় সুন্দর তৈয়ারী।" রাম দুলাল অবিলম্বে ঐ বাটী যথা সর্ব্বস্ব সহ অর্পণ করিলেন। গুরুদেবের আপত্তি ওজরে কোন ফল হইল না; বরং বলিলেন, "গুরুদেব! আমার জীবন শ্রীপাদ পদ্মে অর্পিত, আমি আপনারই, অর্থ সম্পদ যাহা কিছু সকল আপনার বলিয়া জানি; যাহা কিছু উচ্ছিষ্ট তাহাতেই আমি পরিতৃপ্ত।" **১২৫৪** বাং সনের ১৬ বৈশাখ দান পত্র যথারীতি সম্পাদিত হইয়া গেল। এভাব কত মধুর। এরূপ গুরুর প্রতি নিষ্ঠা কৃচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

রাম দুলালের গুরু ভক্তি অসাধারণ ছিল। এক সময় নন্দী বংশের অনেকেই কাশী যাইতে প্রস্তুত হইলেন। রাম দুলালের সহধর্ম্মিণী আনন্দময়ী তাহাদের সঙ্গে যাইতে অতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন; কিন্তু আনন্দময়ী কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছেন না। তখন, যেমন একদিকে অপর সকলেই নৌকায় উঠিয়া কাশী রওনা হইলেন, রামদুলালও আনন্দময়ীকে সঙ্গে করিয়াই স্বতন্ত্র নৌকায় প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য সম্ভার লইয়া যাত্রা করিলেন। যাত্রীদের সকলেই নৌকা উত্তরাভিমুখে ছাড়িলেন। কিন্তু রামদুলাল তাঁহার নৌকা দক্ষিণ দিকে লইয়া যাইতে হুকুম করিলেন। সঙ্গে তাঁহার গৌর খানসামাও চলিল। নৌকা দক্ষিণাভিমুখে গিয়া গুরুজীর ঘাটে উপস্থিত হইল।

আনন্দময়ী ও রাম দুলাল উভয়েই নৌকা হইতে নামিলেন। তখন শ্রীগুরু ও শ্রীগুরু পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কাশীধাম যাইবার নিমিত্তেই রওনা হইয়া এসেছ নাকি?" গৌর খানসামা চৌকি ও আসন নৌকা হইতে আনিয়া উপস্থিত করিল। দেওয়ান রাম দুলাল নিবেদন করিলেন, "প্রভু! আপনারা দুই জনেই এই আসনে উপবেশন করুন।" তাঁহারা আসনে বসিলেন। দেওয়ানজী স্ত্রীকে বলিতে লাগিলেন, "এই আমাদের কাশী, ইঁনি অন্নপূর্ণা, ইঁনিই বিশ্বেশ্বর, ভক্তিভরে ইঁহাদের পূজা কর– ইঁহাদিগকে দর্শন কর। অন্যের কাশী অন্য স্থানে থাকিতে পারে, আমাদের এই কাশী, এই অন্নপূর্ণা এই বিশ্বেশ্বর; এই দুই যুগল চরণ পূজা কর ; যে সমস্ত জিনিস পত্র আনিয়াছি সমস্তই এই পাদপদ্মে অর্পণ কর। ইহাতেই কাশী যাওয়ার ফল হইবে; আমাদের কাশী এইখানেই।" তাঁহারা তেরাত্র গুরুগৃহে বাস করিলেন, তারপর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

আর একটি ঘটনা তাঁহার জীবনে গুরু ভক্তির বিশেষ পরিচায়ক। এক সময়ে তিনি রাজধানী হইতে একটি রূপার হুক্কা ও দামী একটি শাল গুরুর পাদপদ্মে অর্পণ করিবেন মানস করিয়াই বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। পর দিন ভোর বেলা শ্রীশ্রী গুরুদেব তাঁহাকে পদধূলী দিতে আসিলেন। নূতন হুক্কায় তাঁহাকে তামাক দেওয়া হইল। এবারও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে প্রশংসার ভাবে হুক্কাটির সম্বন্ধে কথা বাহির হইয়া পড়িল। শিষ্য তদ্দন্ডেই জানাইলেন, "আপনার জন্যই ইহা আনিয়াছি।" প্রভু অবাক, যেন দু হৃদয় কোন স্বর্গীয় বন্ধনে এক হইয়া পড়িয়াছে। দাসত্ব মাধুরিমায় প্রোজ্জ্বল হইল। বিমান ক্ষিতি একস্থানে মিলিল। ইহাই সিদ্ধ ভাব। তিনি শালটা আনিবার জন্য গেলেন কিন্তু উহা কোথাও দেখিতে পাইলেন না। সেই সময় জানিতে পারিলেন চাকরাণীই উহা গোপন করিয়া রাখিয়াছে।

সে মনে করিয়াছিল, ঠাকুর বেশী লোভী, যা দেখিতে পায় তাই নিতে চায়। শালটী চক্ষে পড়িলে না নিয়া ছাড়িবেনা ; এই শাল লুকাইয়া রাখিলে তাহার মনিব বেশী খুশিই হইবেন। দাসী স্বপ্নেও ভাবে নাই অমৃতে বিষ ফলিবে। রাম দুলাল অতিশয় রোষের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তুই আমার গুরু সেবার কন্টক, তোর মুখ আমি আর দর্শন করিব না।" এই কথা শুনিয়া দাসী তাঁহার পায় জড়াইয়া পড়িল ; স্ত্রী দৌড়ে এসে অনেক বিনয় ব্যগ্রতা করিলেন, মুন্সী মহাশয় পরে একটু সুস্থির হইয়া বলিলেন, যাউক, তবে সে আমার শ্রীগুরুর নিজ বাড়ীতে গিয়ে তাঁহার শ্রীপদ সেবায় জীবনপাত করুক; ভরণ পোষণ ভার আমি নিলাম। দাসী স্বীকৃত হইল, উপায়ান্তর অভাব; উহাই একমাত্র শরণি। পরে মুন্সী মহাশয় ভক্তি প্রণতঃ কলেবর হইয়া ঐ শাল ও হুক্কা ঐ মুহূর্ত্তে গুরুদেবের চরণে রাখিয়া শান্তি লাভ করিলেন। বাস্তবিক অভিন্ন হৃদয় গুরু-শিষ্য, অদেয় কি থাকিতে পারে! গুরু ভক্তি যার হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই এ বিশ্ব ছেড়েছে। দেব কি নর কিছুই তার সমান নহে।

আর একটি ঘটনায় দেখি, মানুষের হৃদয়ের গভীর সরল মধুর ভাবে বিভোর হইতেন। একদিন কার্য্য স্থল হইতে হস্তী পৃষ্ঠে লোকজনসহ নিজ বাড়ীতে ফিরিতেছেন। পথে এক মুসলমান ভিখারিনী তাঁহার কাছে কিছু যাচঞা করে, তিনি তৎক্ষণাৎ দশটি রৌপ্য মুদ্রা দিলে ঐ মেয়ে আশীর্ব্বাদ পড়িলেন, " হে খোদা তুমি সদয় হও, ইঁহাকে গ্রামের পাটোয়ারী কর।" এদিকে সহচর কয়জন হাসির রোল করিল। মহাত্মা দুলাল অমনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, "হৃদয় যার সরল, তার যে কোন আদেশ ফল প্রসব করে।" এ মেয়ের আশীর্ব্বাদ সমগ্র বিশ্ব লইয়াই হইল, যেহেতু এর চেয়ে উন্নততর উচ্চ লক্ষ্য এ স্ত্রী হৃদয়ে আর নাই। সর্ব্বস্ব সে গ্রাম্য পাটোয়ারীর ভিতর রাখিয়াছে।

এরূপ অনেক ঘটনায় জানিতে পারা যায় রাম দুলাল সুযোগ্য পুত্র ধনের অধিকারী হইবেন বলিয়াই এত উদার মহিমায় মানব লীলার উচ্চতম শিখরে উঠেন। বাড়ী ঘর গুরুকে দিলে সংবাদ অগৌনে শ্রীমন্মহারাজার নিকটে পৌঁছিয়াছিল। তিনি প্রিয় দেওয়ানের নিমিত্ত নূতন দালান কোঠা দেওয়াইলেন। এই বাড়ীতেই দেওয়ান রামদুলাল শেষ জীবন যাপন করেন। ইহাতেই আরাধ্য "দয়াময়" নামের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই বাড়ীকে আমাদের সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্ধার ভূমি মনে করিব এবং সকলের সঙ্গেই এ স্থানের যোগ রহিয়াছে দেখিব।

এই ভাবে জীবন যাপন করিয়া পরলোক গমনের জন্য তৈয়ারী হইলেন। আদেশ হইল, "তুমি মরিলেও আবার বাঁচিবে।" দুলাল কলিকাতা রওনা হইলেন। বাংলা ১২৫৮ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণ কলিকাতা মোকামে ভাগীরথী তটে "গন্ড শিলা" রোগে দেহ ত্যাগ করিলেন। সহচর যাহারা ছিল, তাদের পূর্ব্বেই জানাইয়া ছিলেন, "মার নির্দেশ, আমি মরিলেও আবার বাঁচিব ; সুতরাং আমার শরীর দাহ না করে, অপেক্ষা করিও।" এ জন্য তাহারা অনেক সময় প্রতীক্ষায় রহিলেন। সকলে পরে বিধি সঙ্গত তাঁহার পূণ্যময় শরীরের সৎকার করিলেন।

রাম দুলালের সহধর্ম্মিনী সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। ১৩০০ সালের বৈশাখ মাসে তিনি কাশীধামে মরলীলা সংবরণ করেন। তিনি আগপর হিন্দু বিধবার সকল নিয়ম মানিয়া চলিতেন। পুত্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেও ইনি কদাপি হিন্দুর আচার নিষ্ঠা পরিত্যাগ করেন নাই। স্বামীর ধর্ম্মে ও মার নামে বিশ্বাস রাখিয়াই ইনি দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে স্বামিজী একবার অষ্টমী পূজার দিন দুর্গা প্রতিমা মন্দির হইতে অন্য ঘরে নিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

জননী ছেলের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া আবেগের সহিত মার নামে 'ধরণা' দিলেন। কালী মার আশীর্ব্বাদ পাইয়া রাম দুলাল গৃহিনী আশ্বস্তা হইয়াছিলেন। মা জানাইয়া ছিলেন, "তোমার আনন্দের মধ্যে আমিই রহিয়াছি। " মার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া স্বামিজী হিন্দু ধর্ম্মমতেই একজন জ্ঞাতি দ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম, শিক্ষা ও সংসার

দেওয়ান মহাশয় সংযমী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার আয় যথেষ্ট ছিল, জমিদারী এবং নগদ টাকা কড়িও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী আনন্দময়ীও অনুপমা সুন্দরী ছিলেন। সকল প্রকারেই মাতা যেমন পিতাও তেমনি সাধন সম্পর্কে এরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন যাতে তাঁহারা এরূপ একজন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক পুত্র লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। শিশুর বয়স যখন পাঁচ ছয় মাস তখন একদিন প্রভাত সময় মা শিশুকে শয্যায় রেখে পাশে বসে আছেন। সহসা এক ভয়ংকর বিষধর পানক সর্প দালানের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতঃ শিশুকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শিশুর মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া দুলিতে লাগিল। মা সম্বিত হারা, পিতা অপর কক্ষে বসিয়া রহিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ মার চীৎকারে পিতা রাম দুলাল ঘটনা শুনিলেন এবং আদেশ জানিয়াই বোধ হয় কপাট বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইতে প্রসূতিকে সনির্ব্বন্ধ আজ্ঞা করিলেন। জননী অগত্যা তাহাই করিলেন। মনে ভাবিলেন শিশু আর বাঁচিয়া নাই। কিছুকাল পরে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, কোথায়ও কিছু নাই। শিশু 'আনন্দ' কোমল হস্তপদ সঞ্চালনে শৈশবামোদ উপভোগ করিতেছেন। রাম দুলাল ঘটনার তথ্য অন্বেষণে এতক্ষণ ধ্যান-নিমগ্ন থাকিয়া জানিলেন বড় সৌভাগ্য। মা ঈশ্বরী স্বয়ং শিশুকে ক্রোড়ে লইতে ভূজঙ্গিনী বেশে আসিয়াছিলেন। জগত পবিত্র হইল। শিশু ভবিষ্যতে অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় প্রচার করিবে, এ আনন্দ প্রভাতে তাই জগজ্জননী শিশুকে কোলে নিয়ে চির আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। এই গূঢ় রহস্য সাধক রাম দুলাল ঐ সময়েই তদীয় পত্নীকে আনন্দোচ্ছ্বাসে ডাকিয়া জানাইয়া ছিলেন, "আমি আজ নিশ্চিন্ত হইলাম, মা আমার আনন্দকে কোলে নিলেন।" শুনিয়াছি, তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার

স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "দেখ তুমি শোক করিও না; আমি তোমাকে যে পুত্রের কাছে রাখিয়া যাইতেছি, স্বয়ং মা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাকে কোলে লইয়া ছিলেন। এ পুত্রের চেয়ে অন্য কোন অধিক মূল্যবান রত্ন জগতে সম্ভবেনা।"

শ্রী আনন্দের বয়স কুড়ি বৎসর না হইতেই রাম দুলাল পরলোক গমন করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই শাক্ত মতে তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। বিবাহও অল্প বয়সে হইয়াছিল। তিনি দেখিতে রূপবান এবং বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। বেজুরা নিবাসী স্বর্গীয় কাশীনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীশ্রী জয়দুর্গা দেবীই তাঁহার পত্নী। তাঁহার শরীরের রঙ কালো ছিল, এবং দৈহিক গঠন, কিংবা চক্ষুর আয়তন সকলের ভক্তি আকর্ষণ করিত।

লেখাপড়া সম্বন্ধেও দেওয়ান মহাশয় একমাত্র পুত্রের বন্দোবস্ত বিশেষ ভাবেই করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী, পার্শী, সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দ্দু প্রভৃতি বহু ভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত তাঁহার গান অতিশয় গভীর ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এখানে কয়েকটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হইল :-

(১)

রাগিণী-ইমন কল্যাণ-তাল কাওয়ালী

গায় পরং তং মাধুরং।
রব-কারণং জ্ঞানময়ং তং মাধুরং॥
সারাৎসারং রাগ সমূহৈর্ভৈরব- শ্রীমহলারবস স্তের্যন্ত্রৈর্যো- জিতৈঃ;
শিবমবরং রব-কারণং জ্ঞানময়ং তং মাধুরং।
শুদ্ধমরূপং সর্ব্বসমীপং, কৃপা নিধানং জগদাদিরূপং;
সত্য স্বরূপং সকলরসং ধ্রুবমানন্দং শান্তমুদারং মাধুরং ॥ ১॥

(সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ)

(২)

মাল কোশ- চৌতাল

কাশীপতি বিশ্বেশ্বর সিদ্ধি দাতা বদ্রিনাথ,
সুধারো মনকা জঞ্জাল সেওক মাঙ্গে তেরী সাথ।
জপন মনন ধ্যান কেয়্ছে করো নাহি মোরা করম ধরম
বেরথা দিন যাত্ মাধব নাম তেরি দয়া সিন্ধু বাখানে
জগত সনসার দিন রাত।
অন্ধ কোপ বিচমে মায় পড়িহো নাহি দিয়া তেরি চরণ যো
ছিনেমে ধরো জ্যোত, করণ কারণ হর্ত্তা কর্ত্তা গনেশ জননী
রাজ কার্ত্তিক, ভূপাল জলদ বরণ শ্রীবৃন্দাবন গোবর্দ্ধন ব্রহ্মধাম নরনাথ।
॥২১৬॥

(সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-২য় ভাগ)

(৩)

রাগিনী খাম্বাজ-তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরী–

এল শেষ দিন, নর নারীগণ, পাবে পরিত্রাণ, বল দয়াময়।
জনমের ধার, জীবনের ভার, শোধিতে হইবে, প্রেম চন্দ্রোদয়।
শরীর সাধন, জীবে পরিত্রাণ, করিবেন এবার, হইয়ে সদয়।
ভ্রাতা ভগ্নীগণে, বসবে একাসনে, বিবাদ কলহ, হইবেক ক্ষয়।
বহুনাম পেয়ে, ধরিলে হৃদয়ে, এবে দয়াল নামে, পাবে সমুদয়।
নর নারীগণে, স্বর্গের সোপানে, যাবে নামের গুণে, আর নাহি ভয়।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ

এ ছাড়া তাঁহার বিরচিত ধর্ম্মগ্রন্থ আছে। তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত লইয়াই তিনি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। 'প্রকৃত তত্ত্ব'ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যোগ প্রণালী নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকা তাঁহার জীবৎ কালে বাহির হইয়াছিল।

সংসারে প্রবেশ করিয়া মান-সম্ভ্রম, যশ-প্রতিপত্তি এবং জমিদার সুলভ দোষ লইয়াই আনন্দ মহারাজ কাল যাপন করিতেছিলেন। নগদ টাকা অনেক ছিল, জমিদারীর আয়ও ছিল এবং বসত বাড়ী, জমি ও দালান ইত্যাদিতে সম্পত্তি সেকালে খুব বেশীই ছিল।

দৈব ঘটনা মূলেই তিনি সহসা সংসারে বৈরাগ্যের সন্ধানে, সত্যের অনুধাবনে ব্রতী হইয়াছিলেন। জনশ্রুতি রহিয়াছে, একদল জোয়া চোর আসিয়া টাকা মোহর করিয়া দিবে এইরূপ প্রস্তাব তাঁহার নিকটে করিলে, তিনি তাহাদের সকলকেই দালানের কোঠায় আবদ্ধ রাখিয়া কয়েক হাজার টাকা দিয়া দেন। পরদিন অনেক বেলা হইলেও কেহই বাহির হইতেছে না দেখিয়া সন্দেহবশত দরজা খুলিয়া দেখিতে পাইলেন ভিতরে কোন লোকজন কিছুই নাই। সকলেই টাকা লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই ঘটনা ঘটিলে পরই তাঁহার জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তাঁহার ঈশ্বরীয় চিন্তা প্রবল আকার ধারণ করে, এমন কি সকল ঘটনার অন্তরালে গোঁড়ায় কে আছেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কাহার শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, মানুষ মরিলে বা কোথায় কিভাবে অবস্থিতি করে- এই প্রকারের প্রশ্নের তাড়না তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলে। তিনি একাকী দালানের উপরের তলে পড়িয়া থাকেন এবং ফলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে তাঁহার সমীপে কোন সত্য আবির্ভূত হয়।

সংসার শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে এরূপ বন্দোবস্তও তিনি করিতে পারেন নাই। সংসার খরচ চলিয়া গিয়াও সঞ্চয় হইতে পারে এরূপ সংস্থান বা ব্যবস্থা থাকিলেও ক্রমে ঋণের পরিমাণই বৃদ্ধি

শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ

পাইয়াছিল। বিষয় চিন্তার চাপে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করা যায় কিনা এই চেষ্টাও পুনঃ পুনঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারা গেল না। ঋণ লইয়াই পরিবার চলিতে লাগিল।

তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। অন্য সন্তান কয়েক জন কেহ সূতিকা গৃহে, কেহ অল্প বয়সে, কেহ বা গর্ভাবস্থাতে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন। সংসারে খুড়তুত ভাই ছিলেন। এক পরিবারেই সকলে বাস করিতে লাগিলেন। আচার্য্য মহারাজই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

তাঁহার ভাই ঁ কৈলাশ চন্দ্র নন্দী কুমিল্লা জেলা স্কুল হইতে বৃত্তি লইয়া শেষ পরীক্ষায় পাশ করিয়া ঢাকা কলেজে পড়িতে যান। তখন তাহার সহিত আচার্য্য মহারাজের পুত্র ঁ মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয় ঢাকা থাকিয়া পড়িবেন এই ব্যবস্থা করা হয়। পড়ার খরচ চলিতে পারে অথবা এ বিষয়ে সাহায্য হয় এই উদ্দেশ্য নিয়াই তিনি জনৈক বন্ধুর সহিত সেখানে ঔষধের দোকান খুলেন। কিন্তু ঈশ্বরের কি অভিপ্রায় বুঝা যায় না। দোকানটীও বেশী দিন থাকিল না।

একবার সংসারের সংস্থানোদ্দেশ্যেই নন্দী বংশের গৌরব স্বর্গীয় কালী নাথ নন্দীর (Extra Assistant Inspector of Police) সঙ্গে শ্রীহট্টে কোন পর্ব্বতে হাতীর খেদাও করিয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার পক্ষে লাভ জনক হইতে পারে নাই।

সংসার যাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট নাই, হাজার চেষ্টাতেও তাহার জীবনে অশান্তির স্রোত নিবারিত হয় না। যে উদ্দেশ্যে যাহার জন্ম সে উদ্দেশ্য যাতে সাধিত হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ঈশ্বর তাহার জীবন পথ নিয়মিত করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ ও সর্ব্ব ধর্ম্মের আবির্ভাব

হাতীর খেদায় অবস্থান সময়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 'তত্ত্ব বোধিনী' পত্রিকা পাঠ করিতেন। ফলে আস্তে ধীরে পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার অন্তরে প্রতিকূল ভাব জাগিয়া উঠে, এমনকি ১২৭৩ বাং সালে ঢাকায় পূর্ব্ব বাংলা ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে তিনি তাঁহার ভ্রাতা ˝ কৈলাশ চন্দ্র নন্দীর (Then a student of the Dacca College) সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষাও গ্রহণ করেন। বেশী দিন না যাইতেই তাঁহার নিজ বাড়ীতেই কালীকচ্ছে সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্ম উৎসব করেন। এই উৎসব সম্পর্কে স্বামীজীর লিখিত আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃত হইল ঃ-

সন ১২৭৬ বাংলা

"গত আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজার সময় শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গ চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত বাবু বরদা কান্ত হালদার, শ্রীযুক্ত বাবু রজনী কান্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশ চন্দ্র রায় প্রভৃতিকে উৎসব করার জন্য আমাদের বাড়ীতে নেওয়া হয়। মাতা ঠাকুরাণীর ইচ্ছানুসারে দুর্গা পূজার বারণ করা যাইতে পারে নাই। কেবল স্থানের সুবিধার জন্য বাড়ী মধ্যের সংলগ্ন একস্থানে একটি নূতন গৃহ প্রস্তুত করিয়া দুর্গা প্রতিমা তথায় পূজা হওয়ার জোগাড় করিয়া দিয়া প্রতি বৎসর যে দালানে পূজা হইত তাহাতে ব্রহ্মোৎসব করা হয়। নবমী দিবস পৌত্তলিকগণ সকলে পরামর্শ করিয়া মাতা ঠাকুরাণীর উক্ত দুর্গা পূজার পুরোহিতকে পূজা

করিতে নিষেধ করেন ও পুরোহিত সমাজের ভয়ে কাতর হইয়া পূজা ক্ষান্ত করে। তাহাতে মাতা ঠাকুরাণী ও খুড়ী ঠাকুরাণী লোকের গঞ্জনা ও পরামর্শে বাধ্য হইয়া আমি ও আমার ভ্রাতা কৈলাশকে ধরিয়া আগত ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে বিদায় করিয়া দিতে ও আমাদিগকে উৎসবে যোগ না দিতে অতি দৃঢ়রূপে অনুরোধ করেন এবং আমাদিগকে বাড়ী মধ্যে এক প্রকার বন্ধ করিয়া রাখেন। আমরা তৎকালে প্রায় ৪/৫ শত লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত ও তাহাদের দ্বারা নানা প্রকার প্রবোধিত হইতে ছিলাম। মাতা ঠাকুরাণী মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িলেন। সামাজিকেরা কেবল আগত ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে দূর করিয়া দেওয়ার বিষয় অনুরোধ করিতেছেন। কেহ কেহ বা আগত ব্রাহ্ম ভ্রাতারা যাঁহারা উপাসনাতে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাদিগের প্রতি কিছু কিছু অত্যাচার করিতেছিলেন। আমরা কোন প্রকারেই তাহাদের কথায় সম্মত হই না ও তাহারাও পূজা হইতে অনুমতি না দেওয়াতে মাতা ও খুড়ী ঠাকুরাণী সুস্থির হইতেছেন না। আমরা সেই বিপদ সময়ে কেবল বিপদ ভঞ্জনের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রকারে দয়াময় করুণা প্রেরণ করিলেন। নবমী পূজার সময় বহিয়া গেল দেখিয়া মাতা ঠাকুরাণী অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, "যদি যথাকালে পূজা না হইল তবে এখন আর পূজার আবশ্যকতা নাই ও কেহকে চাইনা, সকলকেই চিনিলাম ; আনন্দ প্রভৃতি এমন কি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে যে তজ্জন্যই আমার পূজা বন্ধ হইল। ভাল ঠাকুর ও ভাল জ্ঞাতী সকলই যে সুহৃদ জানিলাম।" এই কথার পর পূজা বন্ধ করায় প্রধানমন্ত্রী যে গুরু ঠাকুর তিনি অপ্রতিভ প্রায় হইয়া পূজা হওয়ার অনুমতি দিলেন ও তাহাতে সকলেই স্থির হইলেন। আমরাও উৎসব ক্ষেত্রে আসিয়া ভ্রাতাদের সহিত যোগ দিলাম ও পিতাকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলাম।

দয়াময়ের দয়ার দৃষ্টিতে সে দিবসের ন্যায় যে এ জীবনে আর প্রত্যক্ষ করিয়াছি এমত স্মরণই হয় না।"

ব্রাহ্ম ভক্তেরা বাহির বাড়ীর দুর্গা মন্ডপেই শারদীয় ব্রহ্মোৎসব করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। এই জন্যই দুর্গা পূজার স্থান এবং পুরোহিত নিয়া হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। তৎকালীন হিন্দু সমাজ এরূপ ব্যাপার সহজে বরদাস্ত করিতে পারে এরূপ কারণও ছিলনা। অবশেষে ভিতর বাড়ীর উঠানেই এক চালা করিয়া করা হয়, ব্রহ্মোৎসব দুর্গা মন্ডপেই অনুষ্ঠিত হয়। অদ্যাপি দুর্গা মন্ডপটি ব্রহ্ম মন্দির নামেই অভিহিত হইয়া থাকে এবং উক্ত ব্রহ্মোৎসব ও শরৎ কালে দুর্গা পূজার সময়েই করা হইয়া থাকে।

১২৮৩ সালের কার্ত্তিক মাসে আচার্য্য মহারাজ কলিকাতা গিয়াছিলেন। সেখানে ব্রহ্মর্ষি কেশব চন্দ্র সেন, প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্ম বন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহাই সেখানে যাইবার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। কেহ কেহ বলেন আচার্য্য হইয়া কার্য্য করিবেন এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াই তথায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতা গিয়া থাকিবার সময়েই ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে "দয়াময় নাম" অবতীর্ণ হয়, এবং তিনি ঈশ্বরাদেশ অনুসারে উক্ত নাম লইয়া কার্য্য করিতে ব্রতী হন। তৎকালে সময় সময় তাঁহার নিকট ঈশ্বর বাণী উপস্থিত হইত। কাগজে লিখিয়া সেই বাণী ব্রাহ্ম সমাজে প্রচার করিতেন। এই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার ধর্ম্ম জীবন এক অভিনব পথে চলিতে আরম্ভ করে। ইহাই উত্তর কালে "সর্ব্ব ধর্ম্ম" নাম গ্রহণ করে।

১২৮৩ সালে কার্ত্তিক মাসে ৺কৈলাশ চন্দ্র নন্দী মহাশয় ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। ঢাকাতেই অনুষ্ঠান হইয়াছিল। খবর পাইয়া শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ কলিকাতা হইতে ঢাকা আসেন এবং বিবাহের

প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র লইয়া যাইবার নিমিত্ত বাড়ী চলিয়া যান। বিবাহ মঙ্গল মতেই সম্পন্ন হয়, কিন্তু তিনি আর ফিরিয়া ঢাকা যান নাই। বাড়ীতে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইল। প্রতি রবিবার কয়েক জন সঙ্গী লইয়া ব্রহ্ম মন্দিরে কীর্ত্তন করিতেন। সঙ্গীত নিজেই রচনা করিয়া লইতেন। একটি সঙ্গীত এখানে লিখিত হইল ঃ-

দয়াময় নামের গুণে, ভব বনে তরে যাবে।
সে যে দুর্গম কানন,
ভয়ে কাঁপে মন, জান না কখন, বিপদ ঘটিবে (রিপুর হাতে)।
সজীব সবশ হয়ে একমনে, প্রাণপণে চল আপন সদনে;
নির্ভয়ে যাইবে, কেহ না বাধিবে, হৃদি মাঝে দয়াল নাম জপিবে।
নাম রস পানে প্রমত্ত হইলে, ডুবিয়ে থাকিবে সুধা সিন্ধু জলে;
হইবে গোষ্পদ সম ভব হৃদ, প্রভুর কৃপাগুণে সকল পরিষ্কার হবে।
(সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ)

রাত্রিতে কিয়ৎ কাল ভিতর বাটীতে নিজের শয়ন প্রকোষ্ঠে থাকিয়া চলিয়া আসিতেন এবং সমস্ত রাত্রি বাহির বাড়ীর উঠানে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া কীর্ত্তন করিতেন। নিরামিষ খাইতেন। মধ্যে মধ্যে ক্রমাগত কয়েকদিন উপবাস করিতেন, কিছুই গ্রহণ করিতেন না। তিনি যেমন অনাহারে থাকিতেন তাঁহার সহধর্ম্মিনীও সঙ্গে সঙ্গে কিছু না খাইয়াই অবস্থান করিতেন। পায়খানা নিজের নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে করাইয়া ছিলেন। উহাতে কবাটও দেওয়াইয়াছিলেন অন্য কেহ উহাতে যাইতে না পারে।

এ সমস্ত ঘটনা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে উন্মাদ মনে করিতেন ও সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিয়া কৈলাশ চন্দ্র নন্দী মহাশয় তদীয় একমাত্র পুত্র ভক্তিভাজন ঁমহেন্দ্র চন্দ্র নন্দীকে কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখেন। কতিপয় মহাজনও এ সময় নালিশ দায়ের করিয়া আইনতঃ প্রাপ্য টাকার ডিক্রি লইয়া ছিলেন। মহেন্দ্র বাবু তখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে শেষ পরীক্ষার (Final Examination) জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এদিকে বাড়ী-ঘর সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইবে আশঙ্কাও প্রবল হইয়া পড়িল। সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি শেষে পড়া ছাড়িয়া পরীক্ষা না দিয়া বাড়ী আসেন।

১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আচার্য্য মহারাজের দুই কন্যার ব্রাহ্ম মতে বিবাহ দেন। প্রথমা কন্যাকে কুমিল্লা নিবাসী শ্রীযুক্ত গুরু দয়াল সিংহ মহাশয়ের নিকট ও দ্বিতীয়া কন্যাকে কালীকচ্ছ নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বিজ দাস দত্ত (যিনি চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল এবং যিনি কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নার্থে ইংলন্ড গিয়াছিলেন) মহাশয়ের নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহ সভায় বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। তৎকালে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ থাকিয়া তাঁহার উপাসনায় আনন্দে যোগ দিয়াছিলেন।

এ সময়ে দান পত্র দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি তিনি তাহার পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করেন। এতদ্বারা সংসারের সকল ভাবনা চিন্তার অবসান হইয়া যায়। সুতরাং একমাত্র সাধন ভজন ব্যাপার লইয়া দিন পাত করিবার সুযোগ এই প্রকারেই তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ক্রমে দেখা গেল, দু-চার জন লোকও আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহন করিতেছে। ইহাও তখন রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, ঈশ্বর দয়াময়ের নামে দান না করিলে তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না।

আবার ফিরিয়া ১২৮৪ সালের আশ্বিন মাসে ব্রহ্মোৎসব উপস্থিত হইল। উৎসব কালে নতুন গান বিরচিত ও এই গানের সঙ্গে সঙ্গেই 'দয়াময়' নামের মহিমা প্রচারিত হইল। জগতে এই নামেই প্রকৃত শান্তি আসিবে এরূপ সংবাদ সকলের অন্তরে আশা ও শক্তির সঞ্চার করিল।

অষ্টম সার্ব্ব সাম্বৎসরিক উৎসবের কীর্ত্তন

দয়াময় নাম শান্তি সুধা সমুদ্র মন্থনে এল ভুবনে
এল ভুবনে, এল ভুবনে (ওরে ঐ দয়াময়) (চেয়ে দেখরে)
ও আরে এই দয়াময়, ও আরে সিংহ রবে এই দয়াময়,
ও আরে মধুর রবে এই দয়াময়।
সুরাসুর ভাল মন্দ একত্র হইয়া।
ওরে বাসুকী কুন্ডলী রজ্জু মেরুতে যুজিয়া ॥
লাবণ্য লালসা অহঙ্কার বল হতে।
ওরে স্বয়ম্ভু সাধন মেরু যোগ পরমেতে ॥
বিষয় বাসনা সিদ্ধ অসিদ্ধ যোগেতে।
ওরে সম্মুখ সংগ্রাম বৈর প্রেম দুই যাতে ॥
বনবাস গৃহবাস সাধু সঙ্গ কত।
ওরে ভাব সাগরের জলে করিল আঘাত ॥
প্রাণ বায়ু কারণ বারি আন্দোলিত করে।
ওরে বিষাদ গরল প্রেম-অমৃত সঞ্চারে ॥
হৃদয় রবির আকর্ষণে জগত মেরু ঘুরে।
ওরে অপার সাগর দয়াময় সুধা দান করে ॥

এই উৎসব সময় হইতেই সাধন সম্বন্ধে তাঁহার উন্নতির অবস্থা আসিতে থাকে ও শিষ্য সেবক অনেক আসিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব সাধক শ্রীযুক্ত কামিনী কান্ত ঘোষ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রী আনন্দের জীবন ধারা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। ১২৮৮ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার মধ্যে দয়াময় নামের কার্য্য অল্পে অল্পে পরিস্ফুট হইতে ছিল- বিশেষ ভাবে ১২৯১ সালের ১১ আষাঢ় হইতেই তাঁহার মধ্যে সর্ব্ব ধর্ম্মানুসারে আদর্শ জীবনের সাধন কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বে ১২৮৩ সালের শারদীয় ব্রহ্মোৎসব হইতেই কয় বৎসরে সর্ব্ব ধর্ম্মের দু-চারটি সুন্দর বিষয় সঙ্গীতের ভিতর দিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। নিম্নোক্ত কতিপয় সঙ্গীত পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে ধারণা জন্মিতে পারে–

(১)

সাধন সিদ্ধ হল না, ছিল এই ভাবনা।
কাল শমনে ঘেরিল ভুবন বিষয় রসে লাঞ্ছনা ॥
মন বলে কবে যাবেরে যাতনা, বিষয় সমুদ্রে নাই সান্ত্বনা;
মানস পটে মুদ্রিত কুবাসনা, হল জীবন শেষ কেন ভেবে দেখনা ॥
কত ব্যাস-বাল্মীকি, ঈশা-মুশা, শিব-শুক-নারদ করি আশা,
বান্ধিল সেতু মিটাইতে ধর্ম্ম পিপাসা, মানব কুলের দুঃখ আর ঘুচিলনা।
আপদ-ভঞ্জন দয়াময়, আইল করিতে সকলে সিদ্ধ কাম,
আলোকিত করিয়া হৃদয় ধাম, করিবে পূরণ সাধকের সাধনা।
ছিল অর্দ্ধ যোগ বিপদ সাধনে, গেল সে ভয় আজ এ নামের গুণে;
কাল রাত্রি পোহাইল, দেখরে নয়নে, শুভ তপন উদিল, যাবে বিড়ম্বনা।

শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ

(২)

সংকীর্ত্তন–তেওট–

বৃথা কেন ভ্রম মন অসার বিষয় লইয়া, তোমার সেবার কার্য্য অলীক
ভাবে আছেরে ভবে প্রখর বিশ্বাস নাহি যন্ত্রণাতে পড়িয়া।
যে দিবে তোমার সুখ, দেখেছ কি তার মুখ
মান সম্ভ্রম সদা লোকে চাহে, না দেখে ভাবিয়া।

তাল-ডগর মালী-

একবাদী হও, তবে পাবে রুদ্ররূপ পরম শান্তির আলয়।
প্রেমে গদগদ হয়ে দেখরে সম্মুখে চেয়ে,
কে আছেরে দাঁড়াইয়ে, অমিয়া মাধুরীময়।
রূপ রস গন্ধ যত, সুন্দর প্রকৃতি কত,
হইল জীবনে হত না পেয়ে তার আশ্রয়।
আমি আজ কারে বলি, কে শুনে হয়ে কুতূহলী
পাতালেতে গেল বলি অলীক প্রেমের আশায়।

তাল–তেওট–

কর সুশীতল বারি দিবস শর্বরী পানে সেবা জুড়াইবে হিয়া।

তাল-যৎ

ভজ দয়াময় নাম, পূর্ণ কাম হবিরে এই সংসারে,
একতাও নামে হবে, অবতীর্ণ প্রভু এবে,
সর্ব্ব জাতি, সর্ব্ব প্রেম, সর্ব্ব ধর্ম্ম এক করে।
মহামন্ত্র এই নাম, জীবনে মুক্তির ধাম,
সর্ব্বনাম প্রাণারাম মরা মানুষ আসবে ফিরে।

তাল-তেওট-

সর্ব্ব বর্ণ সমাবেশ, দর্শনের এই শেষ,
দেখ পূর্ণ জ্যোতি ব্যাকুল হইয়া।

(৩)

নাম-যোগ-কীর্ত্তন

রাগিনী-মুলতান-তাল একতালা। তাল ফেরতা।

মধুময় হলো সংসার। বল মুখে দয়াময় ॥
সাধনের ফল সুবোধ সকল, একবার ভেবে দেখ মনে,
জ্ঞান যোগে নর, হলো অগ্রসর;
বন্ধন মুক্ত এত দিনে হইবে নিশ্চয়।

তাল রূপক

দয়াল নামেতে জগৎ মাতিল,
প্রেমে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ক্রমে,
নারায়ণ নামে শান্ত, রাম নাম হলো যুক্ত,
দাস্য সখ্য ভাব দিল জগজ্জনে;
এল বাৎসল্য দুর্গা কৃষ্ণ যোগেতে,
শিব কৃষ্ণ দুর্গা হরি মধুরেতে।
হরিনাম কালী যোগে ধরিল অনুরাগে,
পাবে বলে শান্তি চরমে।
হলো অর্দ্ধ যোগ তাহাতে পূরণ করিতে দয়াময় নাম হইল উদয়।

তাল ডগর মালী

বল হরি দয়াময় (মনের সাধে) দয়াময় হরি, দয়াল হরি সুখময়।
দয়াময় হরি দীন বন্ধু হরি, যোগেতে হইল হরি হরি হরি।
দয়াময় নামে হরি মিশিল এখন, দয়াময় বল হবে সফল জীবন।
পঞ্চ প্রকার প্রেম জীবনের সার, একে পঞ্চ পঞ্চে এক হইল উদ্ধার।

তাল-ঠুংরী

এখন দয়াময় হইল সর্ব্ব নাম।
যাতে সকলে হবে সিদ্ধ কাম।
আল্‌করিম সমতুল, কির্দ্দগার, মার্শিফুল,
আরবী পারশী ইংলিশেতে বিদ্যমান্
যে নাম আছে যে ভাষাতে, আসিয়া মিশিল তাতে,
ভাষা ছেড়ে কর সবে দয়াময় গুণ গান।
হবে একতা সকলে, এ নাম সাধিলে দূরে যাবে জন্ম দুঃখ চয়।

আমার প্রতীতি এই যে ১২৯১ বাংলা হইতেই তিনি সাধন সিদ্ধির পথে প্রকৃত তত্ত্বোক্ত সিদ্ধাসিদ্ধ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১২৮৮ কিংবা ১২৮৯ সালেই তাঁহার সমীপে "সর্ব্ব ধর্ম্মের" সার 'প্রকৃত তত্ত্ব' নামক গ্রন্থ আবির্ভূত হয়। তিনি প্রত্যাদেশ বাণী বলিয়া দিতেন। তদীয় শিষ্য সর্ব্ব সাধক শ্রীযুক্ত কামিনী কান্ত ঘোষ মহাশয় তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। এই গ্রন্থই একমাত্র গ্রন্থ যাহাতে পঞ্চ পঞ্চাশতটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই ৫৫ তত্ত্ব নিয়াই জগতের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল সন্দেহ বিদূরিত হইতে পারে এবং প্রত্যেকের ধর্ম্ম জীবন প্রস্ফুটিত হইতে পারে। এই গ্রন্থই আদর্শ গ্রন্থ-ইহাই 'দয়াময়' নামের সার সম্পদ।

এই গ্রন্থে এমন কোন কথা নাই যাহা সাধন পথে আমাদের উপকারে না আসিতে পারে। সাধন পথে সিদ্ধভূমির কার্য্য লাভ করিয়া উঠিতে পারিলেই প্রকৃত তত্ত্বের মর্য্যাদা অন্তরে অনুভূত হইয়া থাকে।

১২৯১ সালের দৈনিক উপাসনা গ্রন্থাকারে লিখা রহিয়াছে। **১২৯২** সাল হইতে **১৩০৬** সালের **৩০**শে চৈত্র পর্য্যন্ত এরূপ উপাসনার বিবরণ অনেক আছে কিন্তু তৎ সমুদয় ধারাবাহিক উপাসনা নহে। কোন বৎসরের দশ দিনের উপাসনা আবার অন্য এক বৎসরের তিন দিনের উপাসনা এরূপ বিবরণই বেশী। **১৩০০** সন হইতে পুনরায় প্রতিদিনের উপাসনা কিংবা সঙ্গীতাদির বিবরণ নিয়মিতভাবে লিখিত রহিয়াছে। শেষ কয় বৎসরের লেখা অতিশয় উচ্চ এবং জটিল সমস্যায় পরিপূর্ণ। 'সর্ব্ব ধর্ম্মের' শেষ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি এ সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

১২৯১ সাল হইতে **১৩০৬** সাল পর্য্যন্ত উপাসনা এবং সাধন সম্বন্ধীয় সমুদয় লেখা "সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী" এই নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মহাগ্রন্থ পাঠ করিলে সাধন সম্বন্ধে সকল বিষয়ই জানিতে পারা যায়। 'প্রকৃত তত্ত্ব' যেমন 'সর্ব্ব ধর্ম্মের' মূল গ্রন্থ, এই গ্রন্থ তেমনই 'সর্ব্ব ধর্ম্মের' মহাভাষ্য অর্থাৎ ব্যাখ্যা পুস্তক। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই বরং এই দুইটি গ্রন্থের সমস্ত বিষয় অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিলে অবশ্যই জীবনে "বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যোগ" লাভ হইবে।

আমরা দেখিয়াছি এই দুইটি গ্রন্থের সকল বিষয় উপলব্ধি সহজে কেহ করিতে পারিবেনা। **যিনি একান্ত মনে আচার্য্যের উপদেশানুসারে সাধন করিতে পারিবেন এবং সামীপ্য, সাকল্য, কৈবল্য ও শেষ যোগের কার্য্য লাভ করিবেন তাহার জীবনেই উক্ত গ্রন্থ বিষয়ক তত্ত্বরাজি উপলব্ধি করিবার অধিকার আসিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে তাহা জানিবার কারণ নাই।**

আরও একটি বিষয় এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন– **'দয়াময়'** নামেতেই সকল নামের যোগ আছে এবং এই নামের মহিমাতেই সকল জাতি এবং সকল ধর্ম্ম এক হইবে। নাম লইয়াই জগৎ জীবন মুক্তির আশা পূর্ণ করিতে পারিবে। এরূপ দিনও আসিবে যখন ইহ ও পরলোক বাসী দেব ও নর সকলে একত্র হইয়া কার্য্য করিবে জগতে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে; এমন কি প্রত্যেক নরনারী অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে। কারণ আজ পর্য্যন্ত কেহই সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবার পথ বাহির করিতে পারেন নাই। যে সকল ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তদ্দ্বারা ঈশ্বরেচ্ছানুসারে জগতের উপকারই হইয়াছে-একতার যোগই সাধিত হইতেছে। এখানে চারিটী গান উদ্ধৃত করিতেছি। এ সকল গানের বিষয় চিন্তা করিলে "সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়" কি ব্যাপার উহার সঠিক ধারণা জন্মিতে পারে।

(১)

রাগিনী খাম্বাজ-তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরী–

এল শেষ দিন; নরনারীগণ, পাবে পরিত্রাণ বল দয়াময়।
জনমের ধার, জীবনের ভার, শোধিতে হইবে, প্রেম চন্দ্রোদয়।
শরীর সাধন, জীবে পরিত্রাণ, করিবেন এবার হইয়ে সদয়।
ভ্রাতা ভগ্নী গণে, বসবে একাসনে, বিবাদ কলহ, হইবেক ক্ষয়।
বহু নাম পেয়ে, ধরিলে হৃদয়ে, এবে দয়াল নামে, পাবে সমুদয়।
নর নারীগণে, স্বর্গের সোপানে, যাবে নামের গুণে, আর নাহি ভয়।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ

(২)

মনোহর সাই-একতালা

ভয় নাই আর সংসারে দয়াল নাম সাধরে।
জীবের পরিত্রাণ শুভ বিধান দয়াময় রূপ সাগরে।
মধুর প্রেমের ধন, দয়াময় কর মনন হৃদয় শুদ্ধ হবে অচিরে,
দেখ যাবে ব্যাধি হবে সিদ্ধি মৃত্যু ক্ষয় হবে শরীরে।
শিব শুক নারদাদি, পায় নাই কেউ জীবনের বিধি,
বিধি বিষ্ণু সব যম করে,
এখন অবতীর্ণ মৃত্যুশূন্য দয়াময় রাজ্য বিস্তারে।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-২য় ভাগ

(৩)

রাগিনী খাম্বাজ-একতালা

ভীম গর্জ্জনে উঠিল গগনে দয়াময় নামের কোলাহল,
কাঁপিল মেদিনী মাতিল উল্লাসে নর নারী সবে গাইল মঙ্গল।
বর্ণহীন নিবিড় আঁধার প্রসবিল প্রজা অগণ্য অপার, বহুবর্ণ মত
ভেদের আকার এক যোগে ধবল হইল সকল।

তাল রূপক

হল ক্রমেতে বহু লীলা জগতে।
মৎস্য কুর্ম্ম আদি শিব বিষ্ণু বিধি রাম কৃষ্ণ কালী দুর্গা হতে।
ঈশা, মুশা, দাউদ, গৌতম, মহম্মদ, চৈতন্য, শঙ্কর ধর্ম্ম মতে।
যে ছিল নানা মত, হল সব একমত, আজি মধুর দয়াময় নামেতে।

তাল-একতালা

ভয় নাই আর নাম সুধা সার দূরে গেল, ছিল যত অমঙ্গল।

তাল-যৎ

একচ্ছত্র হইল সংসার, রাজা নাহি আর,
এক প্রভু দয়াময় লইলেন রাজ্য ভার।
রোগ শোক দূরে গেল মরণ রহিত হল,
প্রকৃত সুখ আইল ঘুচিল মন বিকার।
এস নর নারী মিলে, ডুব নামের প্রেমজলে,
দেখ দেখ চক্ষু মেলে, সংসারে স্বর্গ এবার।

তাল-একতালা

গাও নিশি দিন দয়াল নামের গুন,
যা হতে হইল জীবন সফল।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ

(৪)

মনোহর সাই-রূপক

এলরে আজ স্বর্গ রাজ্য ধরাতে,
হল প্রকৃতি মধুময়, সংসারে প্রেমের জয়,
বিয়োগ দোষ দূরে গেল যোগেতে ॥
কালী নাম কৃষ্ণ যোগে, দয়াময় অনুরাগে,
ধরিলেন বিমান ক্ষিতি যোগেতে;
সাধনের মর্ম্ম ভেদি, পুরুষ প্রকৃতি সিদ্ধি,
আনিলেন সদয় হয়ে কর্ম্মেতে ॥
রোগ শোক মৃত্যু গেল, অভাব নিবৃত্ত হল,
হইল পূর্ণ জগত পুলকেতে;
দেব মানব সংগ্রামে একতা হল ক্রমে,
দেব ভাব এল দেখ মানুষেতে ॥
যে নামে যাহার মনন, দয়াময় যোগে সাধন,
কররে জগজ্জন মানসেতে;
দেখবে তাঁহারই রূপ নাম, জীবনে সিদ্ধ কাম,
তিনি প্রকাশ হইলেন সর্ব্ব ভূতেতে ॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-২য় ভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

কার্য্য প্রণালী

তিনি রোজ উপাসনা করিতেন। প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার পরেই সাধারণতঃ উপাসনা হইত। কোন দিন একবার কোনো দিন দুইবার কোনো দিন বা তিনবার তাঁহার উপাসনা করিবার প্রয়োজন পড়িত। 'দয়াময়ের' আদেশ নিয়াই দৈনিক কার্য্য নির্দ্ধারিত হইত। উপাসনা ছাড়া কোন দিন নগর কীর্ত্তন করিয়া গ্রামের পথে বাহির হইতেন। যজ্ঞও করিতেন। যদি দরকার হইত এবং আদেশ অনুসারে আনুসঙ্গিক অনেক রকম কার্য্যই তিনি করিতেন। যে সকল শিষ্য উপস্থিত থাকিতেন তাহাদের জন্য প্রত্যেকের প্রয়োজন মত জপ, ধ্যান এবং কার্য্য ঈশ্বর বাণী দ্বারা জানিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিতেন। রাত্রিতে প্রত্যেকের খোঁজ খবর করিতেন-কোথায় শুইবে বা কে কি কার্য্য করিবে-প্রত্যেক বিষয়েই তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। এই ভাবেই তিনি দিনপাত করিতেন। যাহাদের সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহার চরণাশ্রয়ে বাস করিতে, তাঁহার সহিত নানা জায়গায় ভ্রমণ করিতে তাহাদের মুখেই আমি এই সকল কাহিনী শুনিয়াছি।

তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। কেহ দরিদ্র হইলে তাহার জন্য মাস মাস নিয়মিত হারে টাকা পাঠাইয়া দিতেন। কেহ বা পুত্রকলত্রাদিসহ তাঁহার নিজ পরিবারেই বাস করিত, সকল ব্যায় স্বয়ং তিনিই বহন করিতেন। তিনি জগতের ভার লইয়াছিলেন ইহা তাঁহার কার্য্যেই দেখা যাইত। সত্যই তিনি গাহিতেন–

প্রসাদীসুর-তাল একতালা

কি কাজ আর সংসারে আমার।
আছে জগৎ বাসীর ঘরে ঘরে মণি মুক্তা নানা প্রকার ॥
জন্মের মত বিদায় হব, ভাবে কার্য্যে এক করিব,
দয়াময়ের নাম যাচিব, দেখব সদা প্রেমের বাজার ॥
জগতের সুখ শান্তি হলে, পাব শান্তি চিরকালে,
আমার দেহের পরমাণু বলে নিলাম আমি জগতের ভার।
মিশে গেল শরীর মন, আমার বলে নাই কিছু ধন,
হল দুঃখ অবসান, ছাড়লেম আমি বিষয়ের দ্বার।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ

তাঁহার সহধর্ম্মিনীও তাঁহারই অনুগামী হইয়া কার্য্য করিতেন। প্রাতে উপাসনায় পতির সহিত বসিয়া কার্য্য করিয়া, তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করিতেন। সকলের জন্য দিবা রাত্রি পাকের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। সর্বদা লোক আসিত ও যাইত-অন্নপূর্ণার মত শ্রীহস্তে সকলের অন্ন প্রস্তুত করিতেন। যা পাক করিতেন তা খাইয়া প্রত্যেকে পরম তৃপ্তি অনুভব করিত। সকলের খাওয়া হইলে শেষে তাঁহার আহার হইত। তিনি খাইলে পর কেহ আসিলেও আর পাক করিবার নিয়ম ছিলনা। এই বিবরণ শেষ কয় বৎসর গাছ তলাতে থাকা অবস্থায় লীলা সম্পর্কেই লিখিত হইল। বর্ষা আসিলে তিনি শিষ্যদের বাড়ীতে যাইতেন। নৌকা সঙ্গে থাকিত। লোকজন অনেক তাঁহার সহিত যাইতেন। যে বাড়ীতে যে দিন তিনি গমন করিতেন সে বাড়ীতে সে দিন উৎসবের আনন্দ প্রবাহিত হইত। আহারে বিহারে আলাপ আলোচনায় এবং সাধন ভজনের প্রসঙ্গে সকলে রাত্রি দিবা বিভোর থাকিতেন– ইহা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শেষ জীবনে একদিন তাঁহাকে, আমি যেই বাড়ীতে থাকিয়া পড়িতাম সেই বাড়ীতে

দেখিয়াছি। আমিই তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলাম অন্য গ্রাম হইতে। তাঁহার কথা সারাদিন শুনিতাম। দেখিয়াছি সর্ব্বদাই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই অবস্থান করিতেন। কেহ কোনো প্রশ্ন করিলে উহারও উত্তর দিতেন। যাহারা তাঁহার শিষ্য হইতেন বা রোগাদির জন্য তাঁহার নিকটে যাতায়াত করিতেন, তাহাদিগকে নামই দিতেন এবং জপ সংখ্যাও বলিয়া দিতেন; জপ শেষে নমষ্কার করিবার নামও জানাইয়া দিতেন। সকল নাম সাধারণতঃ কাগজেই লিখিয়া দিতেন। সকলেই ইহা পড়িতে পারে; জানিতে পারে-কিংবা শুনিতে পারে ইহাতে কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই।

এরূপও দেখা গিয়াছে, যেমন স্কুলে ছাত্রদের পরীক্ষা দ্বারা কার্য্যোপযোগিতা নির্দ্ধারিত হয়, তেমন তিনিও শিষ্যদের সাধনে উন্নতি কতদূর হইয়াছে ইহা ঈশ্বর বাণী দ্বারা জানিয়া লিখিয়া রাখিতেন। কোনো বিষয়ে ঈদৃশ পরীক্ষা মূলে কর্ত্তব্য থাকিলে তাহাও লিপিবদ্ধ করিতেন। এই ভাবেই তিনি সাধন বিষয়ে ধারাবাহিক (Systimatic) কার্য্য প্রণালীই অনুসরণ করিতেন। এ সম্বন্ধে ২/৪টি দৃষ্টান্ত তাঁহার লেখা বই হইতে এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম–

১। অন্নদা ঃ ইহার সেবকত্ব সাধন ২ বৎসরের জন্য রহিত হইয়া গেল। ইহার আর সেবার কার্য্য ২ বৎসর পর্যন্ত করা কর্ত্তব্য নহে। কার্য্য কর্ম্মের ত্রুটী হয় বলিয়া যদি কখনও সেবার কার্য্য করিতে চায় তবে “সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়” ১০০ জপ করিয়া সেবার কার্য্য করিবে। দুই বৎসর পর অমানুষিক সেবার কার্য্য আসিবে।

২। বিশ্বম্ভর ঃ সেবাতে নিপূণ ব্যক্তি অথচ গৃহিণীর প্রতি অকল্যাণ যোগ তাহার হৃদয়ে আছে গৃহিণীর সাধনে কালীকা যোগ পূর্ণ না হওয়াতে পরিবার মধ্যে জঞ্জাল ঘটাইয়া থাকে। কৃষ্ণ রাধার সাধনে ও ভীষ্ম দেব সাধনে ত্রুটি আছে।

অতএব "সামীপ্য যোগ ক্রীং রাধা সাধিণী জয় দয়াময়" – এই নাম প্রাতে ২০০ ও মধ্যাহ্নে ১০০ জপ বিশ্বম্ভর করিবে। নমস্কার– ন্যায় বোধিত ব্যাপার সিদ্ধকর জয় দয়াময়।" বধূও রাত্রিতে উক্ত নাম ২০০ ও প্রাতে ১০০ জপ করিবে। নমস্কার–"পতি সাধন পূর্ণ কর জয় দয়াময়" ৮ মাস এই কার্য্য। সেবকত্ব ও শরীর সাধন পূর্ণ হইয়া যাইবে।

৩। মহেন্দ্র ও বধূ ঃ মহেন্দ্রের মধ্যে সিদ্ধি বিদ্যা আজ হইতে বিশেষভাবে উপস্থিত হইল। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম কৃপাযোগে মনের মালিন্য দূর করিতেছে। কালী কর্ম্ম যোগিনী ও শিব সিমন্তিনী বিশেষভাবে কার্য্যের যোগ দিতেছে। দয়াময় নাম শান্তি যোগে আসিয়াছে। কিন্তু উভয় মিলন যোগে শিব সন্ততি অন্তরায় স্বরূপে আছে। শিব সন্ততির অর্থ শিব যোগেতে যে সকল শৈব কেবল উর্দ্ধ দৃষ্টিতেই আছে ও বিমানের কার্য্যই করিতেছে ক্ষিতির ভাবে বিশেষ মনোযোগী নহে। ইহাদের সাধন কখনও অধিক কখনও অল্প পরিমাণে উভয়ের হৃদয়ে সংলগ্ন হইতেছে। ইহার সামঞ্জস্য করা আবশ্যক। অতএব "উমাকান্তি কৃষ্ণ যোগ পরমার্থ তত্ত্ব জয় দয়াময়"। এই নাম জনে রোজ ১০০ জপ ৩ মাস গাছতলায় করিবে। নমস্কার– "কলুষ নাশিনী ক্রীতদাস দাসী জয় দয়াময়।" পূর্ব্বে নামের মধ্যে "সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়" নাম ঘরে বসিয়া জনে ২০০ জপ করিবে ও নমস্কার– "প্রেমতত্ত্ব হরি দয়াময়"।

৪। সিদ্ধি সাধক ঃ শান্তির রাজ্য পাইবার জন্য সকলেই প্রার্থনা কর। শান্তি কোথায় আছে ও তাহা কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অতি অল্প লোকেই জানে। কেহ ভাবে তর্ক করিয়া পরাস্ত করিতে পারিলে শান্তি পাইলাম। কেহবা বিশেষ রূপে আহার করিতে পারিলে শান্তি পাইলাম বলিয়া মনে করে।

কেহ বা সঙ্গীতের দ্বারা শান্তি লাভের আশা করে। কাহারো কাহারো বা মাদক সেবনে শান্তি লাভ এই কথা মনে হয়। কোন কোন ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন সদ্ভাবে হউক আর অসদ্ভাবেই হউক শান্তির কারণ মনে করে। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য পূর্ণ করিলেই কেহ কেহ শান্তি পাইলাম মনে করে। হৃদয় শান্তিকর উপাসনা কাহারো বিশ্বাস হয়। গৃহ জঞ্জাল পরিত্যাগে নির্জন বনে আসিয়া শান্তি লাভ করিব, অনেকের এইরূপ মনের ভাব আছে ইত্যাদি। উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারো চির শান্তি লাভের অধিকার হইতে পারে না। এসব শান্তি ক্ষণস্থায়ী। অন্য সকল ব্যাপার দূরে থাকুক উপাসনাতেও ক্ষণস্থায়ী শান্তি ইহা কিরূপে হইতে পারে। ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে প্রকৃত উপাসনা আজও জগতে প্রকাশিত হয় নাই। দয়াময় নাম আসিয়া প্রকৃত উপাসনার যোগ উপস্থিত করিয়াছে। কালে তাহা হইবার আশা আছে। গুরুর উপদেশ প্রত্যেকেরই আবশ্যক। সেই "গুরু চিন্তা মণি" তাহাকে না পাইলে সে আশা পূর্ণ হইতে পারে না। দয়াময় দয়াময়ী উভয়ে একযোগে চিন্তামণির সাধন আরম্ভ হইয়াছে। এই উভয়ের একযোগে পূর্ণ প্রেমের সাধন আসিয়া চিন্তামণির সাধন পূর্ণ করিবে। মানুষ তখন প্রকৃত গুরু লাভ করিয়া প্রকৃত উপাসনা ও সাধনের শুদ্ধ যোগ পাইয়া আপ্তকাম হইবে। সেদিন সম্মুখে নিকটেই রহিয়াছে। সঙ্গীতে লিখা রহিয়াছে **"দয়াময়ের নাম লাভ দয়াময়ের মুখ পদ্মে"।**

সেই মুখ পদ্মের প্রতি যার একান্ত দৃষ্টি রহিয়াছে তাহার শান্তি লাভের বাধাসমূহ অচিরে দূর হইয়া যাইবে। এখন তোমরা যে মুখ হইতে দয়াময় নাম শুনিয়াছ ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছ তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই আত্মসমর্পণের কার্য্য আরম্ভ হইল। এই পূর্ণ বিশ্বাস হওয়ার নিমিত্তে–"ক্রীং নারায়ণ পূর্ণ মনস্ক সাধন প্রেম

যোগ হৃদয়ে দয়াময়”। এই নাম উভয়ে রোজ ৫০০ জপ করিবে। নমষ্কার করিয়া বল– “তুমি বন্ধু, তুমি শত্রু সাধনেও বন্ধুর কার্য্য করিতেছ জয় দয়াময়”। এই নাম প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে জনে ৩ বার ধ্যান করিবে ও পূর্ব্ব লিখিত প্রার্থনা করিবে। ৬ মাসের মধ্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। সময়ে সময়ে গুরুর কার্য্য কর্ম্ম দেখিয়া মনে যে প্রতিবাদের ভাব আইসে তাহা সাধন পথের কন্টক। এই কন্টক দূর করিবার জন্য– “প্রকটিত ব্রহ্ম হৃদয়ে দয়াময়”। এই ধ্যান রাত্রে শয়নের সময় ৩ বার করিবে। নমষ্কার– “সর্ব্ব যোগে সাধন পূর্ণ কর জয় দয়াময়”।

৫। উদয় সরকার ঃ প্রশ্ন– সাধন কার্য্য কিরূপ চলিতেছে?

উত্তর ঃ সাধন কার্য্য বিশেষভাবে চলিবার জন্য দয়াময় বিশেষভাবে আছেন। সম্প্রতি মহাদেবের যোগ শিবদুর্গা সাধন রাজ্য সূক্ষ্মভাবে মিলনের অভাব দিতেছেন। তাহা সংশোধনের জন্য–“ক্রীং সর্প যোগিনী মনসা নামী করুণাময় হরি সাধিনী জয় দয়াময়।” এই নাম প্রাতে ১০০ ও মধ্যাহ্নে ১০০ জপ করা আবশ্যক। নমস্কার– “প্রেমের মাধুরী জয় দয়াময়”। এক মাসের পরই সাধনের ত্রুটি ভঞ্জন হইয়া যাইবে। ৬ মাস উক্ত কাজ।

৬। জুলমত, সাং দয়াহাটা ঃ আসুরিক সাধন চলিয়া গিয়াছে এখন দেব সাধন আবশ্যক। করিম নামে শান্তি ও রহিম নামে অশান্তি এই উভয় সাধন একত্রিত করিয়া কালিকা সাধনে নাম যোগ পূর্ণ করিলেই এই সকল অভাব দূর হইতে পারে। অতএব– “ক্রীং রহিম, করিম উল্লা হরি ওঁ কৃষ্ণ দয়াময়” ১৭ মাস এই কার্য্য।

১৩০০ বাংলা সালের মধ্যে নানা তীর্থ দর্শনেও তিনি গমন করিয়াছিলেন। শুনা যায় তিনি সুদূর দ্বারকা ধাম ও সেতু বন্ধ রামেশ্বরও গিয়াছিলেন। হরিদ্বার কুম্ভমেলায়ও তিনি উপস্থিত

হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনী ভৈরু রাগিনীতে যে প্রভাত আরতি আমরা করিয়া থাকি, তাহা তিনি শ্রীবৃন্দাবনের মন্দিরে যে আরতি হয়, তাহার সুর শুনিয়াই রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে বৃন্দাবন তীর্থে কোনো এক কুঞ্জে বসিয়া ধ্যান নিমগ্ন হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আচার্য্য মহারাজ শেষ জীবনের ৫/৬ বৎসর কাল নিজ বাড়ীর উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটি আম্র কাননে বসিয়া যে মহা সাধন সমরে ব্রতী হইয়াছিলেন তৎ সম্পর্কে তৎ পুত্র স্বনামধন্য মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয় ‘প্রকৃত তত্ত্বে’র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা যথাযথভাবে নিম্ন উদ্ধৃত হইল ঃ–

“ক্রমে শত শত রোগী, অভাব গ্রস্ত, ধর্ম্মার্থী লোক তাঁহার নিকট আসিয়া কালীকচ্ছ দেওয়ান বাড়ী আনন্দের নিত্য লীলা ভূমি করেন। সকলেই আপন আপন ইস্পিত কার্য্য পাইয়া, প্রেম-কর্ম্ম-জ্ঞান সমন্বয় মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া, অনেকেই তৎসঙ্গেই দিনাতিপাত করেন। পরে ১৩০১ সালে রাত্রিতে একদিন আদেশ প্রকাশ পাইল। এজন্য বাড়ীর উত্তর পূর্ব্ব কোণে জঙ্গলে এক আম্রতলে যজ্ঞ কুন্ড স্থাপনে তথায় মহাকালীর সাধন ব্রতে নিয়োজিত হইলেন।

তাহা দেখিয়া আমি দুইখানা ঢেউটিন দিয়া বৃষ্টি নিবারণের জন্য ছায়া করিয়া দিলাম। কিছুদিন রাত্রে বাড়ী আসিয়া শয়ন করিতেন। ঐ স্থানে যাওয়ার পর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যক লোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। অল্প কাল মধ্যেই লোক পদ-দলনে সমস্ত জঙ্গল ভূমিস্যাৎ হইয়া গেল। লোক সকলকে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটা তাবু টাঙ্গান হইল এবং ক্রমে দুইখানা ঘর তথায় হইল। ঘর হওয়ার পর আর রাত্রে বাড়ী আসিয়া শয়ন করিতেন না। কখন কখন বাহির বাটীস্থ তাঁহার বসিবার কোঠায় আসিয়া বসিতেন,

এবং ব্রহ্ম মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা করিতেন। গাছ তলায় সর্ব্বদাই যজ্ঞাদি হইত। কয়েক দিন পর্য্যন্ত যজ্ঞাগ্নি কখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। প্রায় সর্ব্বদাই রাত্রে গাছ তলায় পুরাণ পাঠ ও প্লেঞ্চেট যোগে দেবতা ও মহাপুরুষগণের সহিত কথোপকথন হইত। সেই সময় ময়মনসিংহ নিবাসী দ্বারকানাথ দত্ত, ফরিদপুর নিবাসী প্রিয়নাথ দত্ত এবং ত্রিপুরান্তর্গত বরদাখাত সাতমুড়া নিবাসী ঁ মনোমোহন দত্ত এই কয়জন যুবক তাঁহার নিকট নিয়ত বাস করিতেন। গাছ তলায় যাওয়ার কিছুদিন পর হইতেই সময় সময় শিষ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন, "আমাকে আর অনেকদিন দেখিতে পাইবে না। এই খানেই অদৃশ্য হইয়া থাকিব"। কেহ কেহ এই বাক্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলে বলিতেন– "দেখিবে না, কোন কোন সময় দেখিতে পাইবে"।

১৩০৭ সনের বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগে পিতৃদেব জনৈক শিষ্যের আহ্বানে চট্টগ্রাম গিয়াছিলেন। আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠা ভগিনী ও ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজ দাস দত্ত তৎকালে চট্টগ্রামেই ছিলেন। বাড়ী হইতে রওনা হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা উভয়েই জ্বর রোগে পীড়িত বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। দ্বিজ দাস দত্ত চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। চট্টগ্রাম যাওয়ার সময় মাতাঠাকুরাণীও গিয়াছিলেন। কিছুদিন স্বীয় জামাতার বাসায় অবস্থিতি করিয়া রুগ্ন জামাতা এবং তাহাদের পুত্র কন্যাদি প্রায় ৮ জন রুগ্ন ব্যক্তিসহ বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে বাড়ী পৌঁছিয়াছিলেন। বাড়ী পৌঁছিবার ৪/৫ দিন পরেই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম কি দ্বিতীয় দিবসে বাবার জ্বর হয়। জ্বর সবিরাম ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রত্যহই জ্বর একবার করিয়া প্রকাশ পাইত। জ্বরের সময় গাঢ় নিদ্রাভিভূত থাকিতেন। কোন প্রকার যাতনা অনুভব করিতেছেন বলিয়া বুঝা যাইত না।

ঐ সময় কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রকৃত উত্তর দিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িতেন। জ্বরান্তে সুস্থ লোকের ন্যায় সমস্ত বাড়ী

বেড়াইয়া অপর রুগ্ন সকলকে দেখিতেন ও শান্তি দিতেন। বাবার জ্বর প্রকাশ পাইবার তিন দিবস পরে মাতা ঠাকুরাণীও প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। মাও বাবার মত রোগ যাতনায় কোনও ভাব, বাক্য বা মুখশ্রীতে ব্যক্ত করেন নাই; কিন্তু মাতা ঠাকুরাণী জ্বর প্রকাশের পর হইতেই প্রায় শায়িত থাকিতেন। বাবা কেবল শেষ তিন দিবস শয্যায় আবদ্ধ ছিলেন, তৎপূর্ব্বে সর্ব্বদাই বাড়ীর সকলের নিকট যাইতেন ও রুগ্ন ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান করিতেন। লীলা সংবরণের দিবস প্রবল জ্বরের অবস্থায় মূত্র ত্যাগের আবশ্যকতা জানাইয়া উঠাইয়া বসাইতে বলিলেন। ধরিয়া বসাইবা মাত্রই উর্দ্ধ নেত্র হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া ভগ্নী শ্রীমতী মুক্তকেশী অধীরা হইয়া পড়িল দেখিয়া তাহাকে বলিলেন– "ভয় কি মা মহাসমাধি"। জ্বরের সময় গাঢ় নিদ্রাভিভূতের ন্যায় থাকিয়াও শিষ্যগণের মধ্যে যে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে সর্ব্বদর্শীভাবে তৎ সমুদয়ের প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন, কেহই শান্তি লাভে বিমুখ হন নাই। পিতৃদেব ১৩০৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশ দিবস রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় এবং মাতা ঠাকুরাণী দুই দিবস পরে অর্থাৎ ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বাহ্য ভবলীলা সংবরণ করিলেন।

আমি নিজে স্বামীজীর পারিবারিক বা সাংসারিক জীবনের খবর রাখিনা। তাঁহার পুত্র অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুর মুখে যাহা শুনিয়াছি ও অন্যান্য গুরু ভ্রাতারা যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিব। প্রথমে স্বামীজীর শিষ্য সেবকেরা, তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেরই পাক একত্র হইত। খরচ পত্র লোকজন যাহা দিত কিংবা পাঠাইত তদ্বারাই নির্ব্বাহ হইত। শুনিয়াছি, আদেশ হইলে তিনি কোনো আগন্তকের মঙ্গলার্থে জানাইতেন, তুমি অমুক নাম জপ করিবে ও এত টাকা দয়াময়ের কাছে আনিয়া দিবে ইত্যাদি। পরে খুব বেশী

বেশী লোকজন আসিতে লাগিল; তাহাদের রান্না স্বতন্ত্র করা হইল। শ্রীশ্রীমা নিজে পাক করিতেন। স্বামীজী শিষ্য সেবকদের নিয়া সংসার পাতিলেন। খরচ পত্র দয়াময়ের কৃপায় জুটিত। যে দিন যাহা আবশ্যক তাহা অবশ্যই মিলিয়া যাইত,– কোন দিন ঠেকা পড়ে নাই। কখনো বা দৈনিক খরচ চলিয়া উদ্বৃত্ত হইত, কোন দিন বা টান পড়িত– কোন দিন হাওলাত বরাত করিতেন, টাকা থাকিলে দিয়া ফেলিতেন। কোন দিন বেশী বেলা হইয়াছে– এমন সময় মার তাগিদ আসিল, আজ কি হবে? স্বামীজীর কাছে দয়াময় বলিলেন, "আজ ফলাহার হইবে"। বাস্তবিক দেখা গেল, কিয়ৎ কাল পরেই কেহ দধি চিড়া ফল ও সকল উপকরণ লইয়া হাজির হইয়াছে। তিনি অজ্ঞান শিশুর মত নিজের দেহ মন দয়াময়কে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন–

"দীন হীন তোমার দ্বারে বসিলাম; তুমি হরষিত কর বা ক্ষুব্ধ চিত্ত দেও, তোমার ইচ্ছা আমার পূর্ণকাম"।

তাঁহার আশা ভরসা সেই পরমেশ্বরের কৃপাতে নিহিত ছিল তাঁহার গানে আছে– **রাগিণী ঝিঁঝিট-তাল কাওয়ালী**

আমি চাইনা কিছু আর,
তোমার চরণ মাথায় করে, ভবে হব পার।
যদি চাই আর অন্য কিছু তবে হবে যাতনা,
মনের মত করব সুধাপান, জন্মের শোধ হবে ধার।
কারে কর সঙ্গোপন, পুণ্য ধামে যাব করে পুণ্য চয়ন;
যথায় প্রেমময়! নিত্য প্রেম বিরাজ করে তোমায়।
কি কাজ আর মিছে খেদে, লাজ করে মজব অপরাধে,
চরণ তোমার সর্ব্বস্ব ধন, মনে এই করব সার।
চরম ফল তোমার চরণে, পাব তায় মোক্ষ ধনে;
শরণ নিব সরল মনে হয়ে দাস তোমার ॥ (সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ)

তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকে আপনার পরিবার মনে করিতেন। ঈশ্বরকে উহার পালনকারী জানিতেন। সুতরাং সেবার ভাবেই তিনি নিজের আপনজন ভাবিয়া সকলের বোঝা মাথায় লইতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তিনি সাধনের ভাবেও দেখাইতেন একাকী কাজের চেষ্টা করা অনর্থক প্রয়াস মাত্র; সুতরাং একাকী উপাসনা তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। একদিন একজন সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইলেন। উপাসনার সময় হইলেই তাঁহাকে উপাসনায় যোগ দিতে তিনি সংবাদ দেন; প্রেরিত মানুষটী ফিরিয়া আসিয়া জানাইল সন্ন্যাসী বলিতেছেন একাকী সাধন করিয়া পার হওয়া যায় না, আবার সকলকে লইয়া যাওয়া। তিনি এই কথাতে উক্তি করিলেন– ইনি ধর্ম্ম রাজ্যে শিশু বলিয়া এইরূপ বলিতেছেন।

আমরা চিন্তা করিয়াছি সমবেত ভাবে উপাসনা ও সাধনার মূলে কি আছে। ঈশ্বরের যোগ লাভ হইলে দেখিবে, জগতের ছোট ও বড়, মানব ও দেবতা সকল বস্তুকে এক ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলের উপাদান এক ভিন্ন দুই নহে; সুতরাং যাহা কিছু দেখিতেছ উহাতেই ঈশ্বরের শক্তি কার্য্য করিতেছে। এজন্যই জানিবে তিনি ভিন্ন আর কেহই জীবনের উপাস্য এবং প্রকৃত আদর্শ হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার সহিত যতই আমাদের যোগ হইবে, তিনি যতই আমাদের নিকটবর্ত্তী হইবেন, দেখিবে জীবের সহিত জীবের পার্থক্য কখনো সম্ভবেনা এবং সকলকে নিয়া কার্য্য করিলেই আর কিছু বাকী থাকিবেনা। ঈশ্বরের ন্যায় আমরাও জগতের জন্যই সাধ্য-সাধনে নিবিষ্ট হইব। তাহা হইলেই আমাদের সহিত তাঁহার পার্থক্য থাকিবেনা। তাঁহার সর্ব্ব রূপ আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইলে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' বলিয়া আমাদের আনন্দের সীমা থাকিবেনা। আমরা জানিতে পারি আমরা আমাদের মুক্তির জন্যই কার্য্য করিতেছি-জীবের

সেবা আমাদের উপদেশমূলক আদেশ মাত্র। সংসারের সকল বিষয় সম্পদ তাঁহার পুত্রকে তিনি দান পত্র করিয়া দিলে আর উহার চিন্তা মাথায় আনেন নাই। তাঁহার ইষ্ট সাধনে তিনি সকল ঐশ্বর্য্যের ভাবনা মনে আনেন নাই।

রাগিনী মূলতান-তাল-ঝাঁপ

ডুবিলাম রূপের ঘরে অরূপ মাধুরীর কলে।
অরি দমন হইল আমার নাহি শঙ্কা কোন কালে।
আজি তোমার দিয়ে নাম, পার হব ভব ধাম,
কোটি কোটি যোগ শাস্ত্র ছাড়িয়ে,
আজীবন ধন্য যোগে লভিব পরম সুখে,
সুমেরু সমান রাজ্য তুচ্ছ হয়ে গেল চলে।
মজিল জীবন মন, নাহি ভবন কানন,
চন্দ্র মিহির তারক সকলে,
কেবল জ্ঞান মূরতি, তোমার সর্ব্ব শকতি
ছাইল ক্ষিতি সকল গোলক রসাতলে।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ

এখন দেওয়ান বাড়ীর ঐশ্বর্য্য নাই–পূর্ব্ব গৌরব নাই, আছে ফকিরী সম্পদ– আছে ঈশ্বরের প্রেম-তীর্থ এবং সেই পরাত্পর নাম **'দয়াময়'** মন্ত্র– সেই সমাধি মন্দির আছে-স্বামীজীর গাছ তলা রহিয়াছে। শ্রীশ্রীমৎ মহেন্দ্র বাবু নিজে চেষ্টা করিয়া তাঁহারি ইচ্ছাতে স্বামীজী ও মাতা ঠাকুরাণীর সমাধির উপর পাকা সুরম্য মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। ইহার পশ্চাতে বাগান আছে, দক্ষিণে প্রকান্ড উঠান, পশ্চিমে পুকুর-বান্ধান ঘাট আছে– সকল দিকে খোলা স্থান আছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে টিনের ছাদ দেওয়াল দেওয়া চমৎকার বারিন্দা আছে। উহাতে বসিয়া নানা জাতীয় স্ত্রী পুরুষ নিত্য ভোজন করিয়া থাকে, ইহাতেই তাহারা শয়ন

করে, এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে মধুর কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দে সমাধি পরিক্রমণ করে।

সমাধি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দার মাঝামাঝি খানিকটা স্থানে শ্রীশ্রী মার উনুন রহিয়াছে। শুনিয়াছি জননী স্বহস্তে এই চুল্লীতে সারা দিনরাত পাক করিতেন। তিনি অন্নপূর্ণা ছিলেন, স্বামী সেবার নিমিত্তই তিনি জীবন ধারণ করিতেন। স্বামীকে তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভাবিতেন, তিনি যে দিন স্বামীর তিরোধান হয় শুনিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে জলও গ্রহণ করেন নাই। তিনি স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে উপবাস করিতেন, উপদেশ শুনিতেন ও পাক করিতেন। বেহানে শয্যা হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইতেন। উপাসনার কালে স্বামীর পার্শ্বে আসনস্থা হইয়া ধ্যানে মগ্ন হইতেন। তিনি যেমন ভাবে ধ্যান করিতেন তাহার তুলনা ছিল না, সারা শরীর মন কাহার অন্বেষণে যেন কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া যাইত। তিনি অপার্থিব মধুর ভঙ্গিতে উপাসনান্তে স্বামীকে নমস্কার করিয়া চরণামৃত গ্রহণে রন্ধনে যাইতেন। দিনের বেলা আর কিছু খাইতেন না– পানের বাটা থাকিত। পাক করিতে করিতে গাছ তলার সকল দেবতার কথা, মহাপুরুষদের কথা পুরাণ-ভাগবতের কথা শ্রবণ করিতেন; কোন কথা কর্ণ গোচর না হইলে বা না বুঝিলে অমনি ডাকিতে ডাকিতে জানাইতেন এবং স্বামীজীও আনন্দে সেই কথার পুনরুক্তি করিতেন। মা নিজে শ্বশুরের সংসারে আসিয়াছিলেন। সোনার গহনা, রূপার থালা, সাজ সরঞ্জাম কত কিছু ছিল। রাজ বাড়ীর মত সমুদয় কাজ কারবার থাকিত। দিনের পরিবর্ত্তনে তাঁহার আর সেই দিন নাই। মা নাকি দুপুর রোদে গাছ তলার ঘাটে স্নানের জন্য নামিতে নামিতে গান ধরিতেন। সাধন পথেও নাকি তাঁহার খুব উন্নতি হইয়াছিল। যেমন ঈশ্বরের নাম এবং দয়াময় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে শ্রী আনন্দের জন্ম হইয়াছিল তেমন তাঁহারি সহ-ধর্ম্মিণী হইয়াও

মা জন্মিয়াছিলেন। উভয়ের পার্থক্য ছিল না। মা বাড়ীতে থাকিতেন, বাবা বর্ষা আসিলে শিষ্যদেরে দেখিতে যাইতেন; তিনি চাতকীর মত উদাস প্রাণে দিন কাটাইতেন এবং বাবা আসিয়াছেন শিষ্যদের কেহ আসিয়া খবর দিলে, মুখের হাস্য ভঙ্গিতেই হৃদয়ের অফুরন্ত আনন্দ ঢালিয়া দিতেন। সময় সময় 'মা' নিজেই উপাসনার কার্য্য করিতেন। নিম্নে তাঁহার একটি উপাসনা "সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী হইতে উদ্ধৃত করিলাম ঃ-

১১ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১২৯১ সাল

হে ঈশ্বর করুণাময় দীনবন্ধু! নাম কীর্ত্তন কিছুই জানিনা, দয়াময় নিজগুণে কৃপা করে উদ্ধার কর। আমি কেমন করে ডাকিব? তুমি দুর্ব্বলের বল, তুমি দুর্ব্বলের গতি, এই ভরসাতে তোমার দ্বারেতে আসিয়াছি; তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে পারি, দীনবন্ধু, তুমি এই আশীর্ব্বাদ দাও। তুমিও নিকটেই রহিয়াছ; কেন যে দেখিতেছিনা দীনবন্ধু কেন আমি তোমার উপলব্ধি করিতে পারিনা? দীনবন্ধু আমি কেমন করিয়া তোমাকে ডাকিব? হে দুর্ব্বলের বল! তুমি সেই বল দিবে। তুমি যা বলাইবে তাই বলিব। আমার জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, আমি যে উপলব্ধি করিতে পারি। মা, এই নামের গুণে কি হইতে পারে? তোমাকে দেখি, তোমাকে ডাকি, তোমাকে মস্তকে ধারণ করি, তোমার চরণ তলে পড়িয়া থাকি, দীনবন্ধু এই আমার আশা। তোমার নাম কীর্ত্তণ করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিতে পারি; তুমিও হৃদয়েই আছ, তুমি ভক্তের কাছেই আছ। হৃদয়ে দৃষ্টি করিলে তুমি হৃদয়েই আছ। তুমি অন্তরে বাহিরে সকল স্থানে সকলের মধ্যে বর্ত্তমান আছ। তোমার এই সৃষ্টি, তোমা ছাড়া কি এক তিলও থাকা যাইতে পারে? যেখানে যাই সেখানেই তুমি। দীনবন্ধু তোমার কত সাধক ভক্ত, মহাজন তোমার নামের রসে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমাদের কি

দিব্য চক্ষু হইবে? তোমাকে দেখিতে পাইব না? তোমার সকল সন্তানইত সমান, ভক্ত সন্তানদিগকে যেরূপ রাখিতেছ, জন্মান্ধগুলিকেও সেইরূপ রাখিতেছ–পথহারা হইয়া যাইবে না। আমার পক্ষেও তুমি আছ। একবারও কি দৃষ্টি করনা? আমরা কাটাশত ভাঙ্গিয়া ঘুরিতেছি। কেন তোমার বাক্যকে অগ্রাহ্য করিয়াছি। আমাদিগকে কে ডাকিতেছেন, দয়াময় আমাদের সেই বল নাই, সেই জ্ঞান নাই, কেননা পাপের বাক্য শুনিয়াছি। পাপ আমাদিগকে ঘুরাইতেছে। দীননাথ! যদি হাতে ধরিয়া না নেও তবে সন্তান বাঁচেনা। হে প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, তুমি কেশে ধরিয়া টানিয়া নেও। আর কুপথগামী হইতে দিওনা। ধরিয়া বাঁধিয়া রাখ। পিতার কি পুত্র কন্যাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়? ধরিয়া রাখিতে হয়। তুমি তোমার মধুর বাক্য দেও। তুমি পাপী ও তাপীর পিতা মাতা। কাঙ্গাল দেখে দয়া কর, দীন দয়াল তুমি কৃপা কর আর যেন তোমার নিকট হইতে দূরে না যাই। দীননাথ প্রভো! তোমার ভাব যেন ছাড়িয়া না থাকি। তোমাকে হৃদয়ে লইয়া ও বসাইয়া এই জীবনের সময়টুকু যেন যাপন করি, সংসারে শান্তি পাই।

॥ জয়ধ্বনি ॥

মা লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার হৃদয় জগতের জন্যই গঠিত হইয়াছিল; জগতের জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি সহধর্ম্মিণী রূপেই স্বামীর সহিত সাধন ভজন করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর দুই দিন গেলে নিজেও তাঁহার অনুগামিনী হন। নিম্নে উদ্ধৃত উপাসনাতে মা'র সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা জানা যাইবে।

১২৯১ সালের ৩১শে আষাঢ়
উপাসনা

মাতা জয়দুর্গা হইয়া জগতকে বিশেষভাবে মনের শান্তি দিলেন। আমাদের আজ যাহা উপাসনাতে আসিল তাহা বড়ই আনন্দদায়ক। আমরা মনের সাধ পূর্ণ করিব মাতার হৃদয়ে। বল জয় দুর্গা /৩/ কেন বল আর অন্য কথা– এই কথা দয়াময় বলিলেন। এই জয়দুর্গার মধ্যে দয়াময় পূর্ণভাবে আছেন। এই মাতা পিতার পূর্ণ সঙ্গিনী। এই জন্য বল 'দয়াময় দয়াময়ী এক যোগে হৃদয়ে দয়াময়।' দয়াময় তুমি /৩/ সকল কার্য্য পূর্ণ করিলে বলিলে তোমাতে বিশ্বাস আজ উপস্থিত কর।

॥ জয়ধ্বনি ॥

স্বামীজী মহারাজ জগতের মুক্তির নিমিত্তে যে নাম লাভ করিয়াছিলেন, সেই দয়াময় নামের উদ্ধারার্থে এবং জীবন মুক্তির পূর্ণ আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য জীবনাতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখনও তিনি সস্ত্রীক-সাধন-মন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কার্য্য করিতেছেন। তিনি তাঁহার ভক্তজনকে বলিতেন, 'মানুষ অমর হইবে-জগতের সকল নর নারীর বিশুদ্ধ-বিবাহ-লীলার অভিনয় হইবে, সকলেই আবার পরলোক হইতে পৃথিবীতে আসিয়া বন্ধু বান্ধবের শোক নিবারণ করিবে ও জগতের মধ্যে দয়াময় নামের জয় ঘোষণা করিবে।' আরও তিনি বলিতেন, 'এই দয়াময় নামের বলেই মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা চলিয়া যাইবে, পৃথিবীতে আসিয়া প্রাচীন ঋষি, মহর্ষি, দেব ও দেবী প্রভেদ ছাড়িয়া নামের মহিমা কীর্ত্তন করিবে।'

রাগিণী খাম্বাজ-তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরী

এল শেষ দিন, নর নারীগণ, পাবে পরিত্রাণ, বল দয়াময়।
জনমের ধার, জীবনের ভার, শোধিতে হইবে, প্রেম চন্দ্রোদয়।
শরীর সাধন, জীবে পরিত্রাণ, করিবেন এবার, হইয়ে সদয়।
ভ্রাতা ভগ্নীগণে, বসবে একাসনে, বিবাদ কলহ, হইবেক ক্ষয়।
বহু নাম পেয়ে, ধরিলে হৃদয়ে, এবে দয়াল নামে, পাবে সমুদয়।
নর নারীগণে, স্বর্গের সোপানে, যাবে নামের গুণে, আর নাহি ভয়।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ

জয় জয়ন্তি- এক তালা

করবে যদি প্রেমামৃত পান, সবে সাধরে দয়াময় নাম ॥
আমরা দেব নরে, প্রভেদ ছেড়ে, এস একতানে করি গান।
দয়াময়ের পূর্ণ আবির্ভাব, ধরাধামে হল এবার গেল অসদ্ভাব।
আমরা দেব সবে তাঁর আশ্রয় লাভে
করব মর্ত্ত্য লোকে অধিষ্ঠান।
দয়াময় নামে দেহ জয়, স্বর্গ এল পৃথিবীতে নাহি মৃত্যু ভয়।
ছিলাম অলক্ষিত, অন্তর্হিত, এখন হলেম মূর্ত্তিমান।
এসরে মানব নিচয়, শঙ্কা নাই আর কোন রূপে হওরে নির্ভয়,
দয়াময় রাজা তোমরা প্রজা, কর পদে প্রেমাঞ্জলী দান ॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-২য় ভাগ

তাল -যৎ

ভজ দয়াময় নাম, পূর্ণ কাম হবিরে সংসারে,
একতাও নামে হবে, অবতীর্ণ প্রভু এবে,
সর্ব্ব জাতি সর্ব্ব প্রেম সর্ব্ব ধর্ম্ম এক করে।
মহামন্ত্র এই নাম, জীবনে মুক্তির ধাম,
সর্ব্ব নাম প্রাণারাম মরা মানুষ আসবে ফিরে।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-২য় ভাগ

মনোহর সাই-তাল; এক তালা

ভয় নাই আর সংসারে দয়াল নাম সাধরে।
জীবের পরিত্রাণ শুভ বিধান দয়াময় রূপ সাগরে।
মধুর প্রেমের ধন, দয়াময় কর মনন, হৃদয় শুদ্ধ হবে অচিরে,
দেখ যাবে ব্যাধি হবে সিদ্ধি মৃত্যু ক্ষয় হবে শরীরে।
শিব শুক নারদাদি, পায় নাই কেউ জীবনের বিধি,
বিধি বিষ্ণু সব যম করে,
এখন অবতীর্ণ মৃত্যু শূন্য দয়াময় রাজ্য বিস্তারে।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-২য় ভাগ

পঞ্চম অধ্যায়

শিষ্যদের কথা–

শ্রীশ্রী আচার্য্য মহারাজের যে কয়েকজন ভক্ত তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আদর্শ লইয়া জীবন গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাদের নাম এখানে দেওয়া গেল :- মহেন্দ্র বাবু, মনোমোহন দত্ত, কামিনী কান্ত ঘোষ, প্রিয়নাথ দত্ত, দ্বারকানাথ দত্ত, গোপাল দাস বাবাজী, জুলমত কারী, কুমার শীল, কৃষ্ণ শীল, বিশ্বম্ভর নাথ, রাম দয়াল সাধু, গোল মামুদ, পঞ্চানন সাধু, চরণ সাধু, অন্নদা, সিদ্ধি সাধক, নবীন কাওলাত, শিবনাথ চঙ্গ প্রভৃতি।

উক্ত শিষ্যদের মধ্যে ঁকামিনী কান্ত ঘোষ, গোপাল দাস বাবাজীই সাধক হিসাবে সকলের নিকট পরিচিত। কামিনী বাবু কালীকচ্ছে আসিয়া সাধন সম্বন্ধে উন্নতির পথে দন্ডায়মান হইয়াছিলেন। আচার্য্য মহারাজ তাঁহাকে ‘সর্ব্ব সাধক’ এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি নিজ বাড়ীতে যাইয়া প্রচারকার্য্যে ব্রতী হয়েন এবং অচির কাল মধ্যে সুনামও অর্জন করেন। তাঁহার আসন (আশ্রম) অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার পরলোক গমনান্তে তদীয় শিষ্য জুলমত তাঁহার গদি প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে আচার্য্য মহারাজ ‘কারী’ উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। এজন্য দয়াময় নামের লোক সকলেই তাঁহাকে জুলমতকারী বলিয়াই ডাকিতেন। এই জুলমতকারীর গুরু ভক্তির অনেক অলৌকিক ইতিহাস আছে। এরূপ ভক্ত অতি বিরল। তাঁহার জীবনের কার্য্যকলাপ জানিতে পারিলে স্তম্ভিত না হইয়া থাকা যায় না। সংযমে তাঁহার ন্যায় লোক দেখা যায় না। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ব সাধক মহোদয়ের ঐকান্তিক শিক্ষা ও অনুগ্রহ বলেই নিরক্ষর জুলমতকারী ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

আজ গুরু শিষ্য দুইজনেই পরলোকে রহিয়াছেন। বিক্রমপুর দয়াহাটা দেওভোগে তাহাদের বাড়ী।

গোপাল দাস বাবাজীর কথা উল্লেখ করিতেছি। তিনি জাতিতে কর্ম্মকার ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইলে পর নিজ বাড়ীর পশ্চিম দিকে একটি পুকুর পাড়ে বসিয়া উদাসীন অবস্থায় ছিলেন। আচার্য্য মহারাজ ঈশ্বরাদেশ পাইয়া তাহাকে কালীকচ্ছ যাইবার নিমিত্ত সংবাদ পাঠাইয়া দেন। কথিত আছে এই ঘটনার পূর্ব্বেই তিনি বৈষ্ণব মতানুসারে ভেক গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাতমোরা নিবাসী পরলোকগত বসন্ত কুমার দত্ত মহাশয়ই কালীকচ্ছের খবর লইয়া আসিয়া সকল বৃত্তান্ত তাহাকে বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহারাজের জীবনের অপূর্ব্ব বিবরণ শুনিয়া বিলম্ব না করিয়াই গোপাল দাস কালীকচ্ছে গিয়া তাঁহার শ্রীপাদ পদ্মে দেহ প্রাণ-মন উৎসর্গ করেন। এমন কি বেশীদিন না যাইতেই একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাধু বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার বহু শিষ্য সেবক ছিল। আজও তাহার সমাধি পীঠ রহিয়াছে-আশ্রমের স্থানও আছে। তিনি গম্ভীর প্রকৃতি ও ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক ছিলেন। তাহার চরিত্র আপামর অনেকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। তাহাকে আমরাও দেখিয়াছি এবং তাহার আশ্রমেও একরাত্রি থাকিয়া আনন্দ ভোগ করিয়াছি। তাঁহার ধৈর্য্য এবং বাক সংযম কিরূপ ছিল, আমি নিজে উপলব্ধি করিয়া-অনেক ব্যাপারে বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আমরা মনে করি তিনিই আমাদের এতদঞ্চলে সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রথম ব্যক্তি। আচার্য্য মহারাজও তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং তাহার সহিত তাহার সম্পর্কিতা কোন একজন শিষ্য কন্যাকে সর্ব্ব ধর্ম্মানুসারে বিবাহও দিয়াছিলেন। সর্ব্ব ধর্ম্মমতে ইহাই প্রথম বিবাহ। এরূপ অনুষ্ঠান ইহার পর আরও অনেক হইয়াছে। সুতরাং এই অনুষ্ঠানই ভবিষ্যতে সর্ব্ব সমাজ গড়িয়া উঠিলে বিবাহ কার্য্যের দৃষ্টান্ত

বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

১২৯১ সাল হইতে **১৩০৭** বাং সালের **১১** জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কত লোক তাঁহার নিকটে নাম লইয়াছিলেন ইহার সংখ্যা করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এরূপ কথা আমরা আচার্য্য মহারাজের পুত্র পরম ভক্তি-ভাজন মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার তিরোধানান্তে তিনি একটি খাতায় সাড়ে দশ সহস্র স্ত্রী পুরুষের নাম ধাম লিখিত শিষ্য শ্রেণীভুক্ত দেখিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রচার কার্য্যেও অনেকে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের কয়েকজন আমরা দেখিয়াছি। এমন কি দু'চার জনের সহিত নিজেও বহুকাল থাকিবার সুযোগ পাইয়াছি। তন্মধ্যে কুমিল্লা জিলার সাতমোড়া নিবাসী 'মলয়া' গ্রন্থকার স্বর্গীয় মনোমোহন দত্ত এবং বিখ্যাত ডাক্তার অশেষ ভক্তিভাজন স্বর্গীয় মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই দুইজন মহাপুরুষের গৌরব চিরকালই দেশের লোক করিবেন। তাঁহাদের অলোক সামান্য প্রতিভা তাঁহাদিগকে আমাদের নিকটে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। অধিকন্তু সাধন সম্পদ কিংবা চরিত্র গৌরব তাঁহাদের যাহা ছিল তাহা দ্বারা ধর্ম্ম জগতে আমাদের উপকার কত রকমে হইতেছে এবং হইবে সেই বিষয়ের বিবৃতি প্রদান করা নিরর্থক চেষ্টাই মনে হইবে।

আজ উপরিউক্ত দুই মহাত্মারই জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে এ স্থলে বর্ণনা করিব। সাতমোড়া গ্রাম কুমিল্লা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার নবীনগর থানার ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানেই **১২৮৪** বাং সালের **১০**ই মাঘ সোমবার উক্ত মনোমোহন দত্ত মহাশয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। লেখাপড়া বেশী হইতে পারে সেইরূপ সুযোগ সুবিধা তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। কারণ তাঁহার পিতামাতার সংসারে বিত্ত-অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল না। দত্ত পরিবার সুদূর অতীতে প্রতিপত্তিশালী থাকিলেও তাঁহার জন্ম সময়ে দারিদ্র্য পীড়নে অবসন্ন হইয়া

পড়িয়াছিল। তিনি বাংলা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলেন। ইংরেজী পড়িবার কোনো সুবিধাই করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে তখনকার মোক্তারী পরীক্ষা পাশ করিবার প্রচেষ্টা করিতে হইয়াছিল। তিনি কয়েকবার চেষ্টার পরেও মোক্তারী পাশ করিতে পারেন নাই। শেষে নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়াই ১৩০৩ বাং সালের শ্রাবণ মাসে কালীকচ্ছে গমন করেন ও শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ মহারাজের শ্রীচরণ পদ্মে জীবন বিসর্জ্জন করেন। এই মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদেই তিনি অভূতপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তির অধিকারী হন এবং সাধন ব্যাপারেও তাঁহার শক্তি সঞ্চারে সর্ব্ব ধর্ম্মের মহা জ্যোতি তাঁহার অন্তরে আবির্ভূত হয়। সংসার অভাব নিপীড়িত ছিল বলিয়া চাকুরীর জন্য কয়েকবার তিনি চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শেষে কোনো পথ না পাইয়া নিজ বাড়ীর দক্ষিণ দিকের ফুল বাগানে একটি বেল গাছের তলায় সাধন সমরে প্রবৃত্ত হন। সঙ্গে শিষ্য মনসুরের সহিত একত্রে থাকিয়া, বেল গাছের তলায় বসিয়া দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত করিতে থাকেন। এ সময় চারিদিক হইতে অনেক স্ত্রী পুরুষ আসিয়া তাঁহার নিকটে দয়াময় নাম লইতে থাকেন। ইহা ১৩১১ বাংলার কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের কথা। বহু অলৌকিক ঘটনাও এই উপলক্ষ্যে ঘটিয়াছিল। তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে শিক্ষিত ছাত্র এবং সম্ভ্রান্ত বংশজাত কয়েকটী যুবক একত্র হইয়া তাঁহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সকলেই বেশী কম ধর্ম্ম জীবন লাভের পিপাসা লইয়াই তাঁহাকে গুরুত্বে ব্রত করিয়াছিলেন।

এ সময়ে দেশ বিখ্যাত ওস্তাদ আপ্তাবদ্দিন কোন রোগ প্রতিকারের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হন। স্বামীজীর কৃপাবলেই তাহার মধ্যে প্রতিভার উন্মেষ হয়। একদিকে আশ্চর্য্যজনক সঙ্গীতের ক্ষমতা

অপরদিকে সাধনার অপূর্ব্বতা তাহার অন্তরে প্রকাশিত হয়। এই মহাপুরুষের শক্তি সঞ্চারের ভিতর দিয়াই আপ্তাবদ্দিন দেশ বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহু যন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সকলে তাহাকে খাঁ সাহেব উপাধি দিয়াছিল এবং সকলের নিকট তিনি প্রফেসার আপ্তাবদ্দিন বলিয়া সুবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমৎ মনোমোহন স্বামীজীর জীবন ধর্ম্মের জীবন ছিল। ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার প্রকৃতিগত সম্পদ ছিল। তাঁহার সহিত মিলিয়াছি, তাঁহার শ্রীমুখের অসংখ্য উপদেশ শুনিয়াছি এবং তাঁহার সহিত একত্রে বসিয়া কত তর্ক করিয়াছি। আমার ধারণা জন্মিয়াছে– তিনি শ্রী আনন্দ মহারাজের একমাত্র শিষ্য, যাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে গুরু শিষ্য উভয়ে পরামর্শ করিয়াই ধরাতলে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মহাপ্রয়াণ হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের করুণাতে আজও রহিয়াছি। তাঁহার বিরচিত গ্রন্থ অনেক আছে। তন্মধ্যে 'মলয়া' (সঙ্গীত গ্রন্থ) প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, ময়না বা পাগলের প্রলাপ, পথিক এবং পাথেয় এই কয়খানাই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সাধক ছিলেন, কবিও ছিলেন, তাঁহার লিখিত কবিতা কিংবা সঙ্গীত পাঠ করিলে মনে হয় যেমন মহাগ্রন্থ 'কোরান' স্বর্গীয় দূত জেব্রিল কর্ত্তৃক বিবৃত হইত; তাঁহার কবিতাও কোনো অজ্ঞেয় পুরুষের অমৃত উৎস হইতেই প্রবাহিত হইত। এ স্থলে ২/৪টি সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হইল।

(১)
রাগিণী বেহাগ-খাম্বাজ-তাল আড়া ঠেকা

ধূঁ ধূঁ করি শুধু হৃদয় শ্মশানে, অনলে অনিলে পেতে দিছ খেলা,
কামিনী কাঞ্চন, বাসনা কামনা, যোগাইছে তারা কাঠ খড়ি চেলা।
জল জল করি শুনি কোলাহল, কোথা পাবে জল পিয়ে হলাহল,
আবেশে বিহ্বল, ফুৎকারে অনল, আশা মায়াবিনী সুচতুরা বালা।
দূরে কাল মেঘ সাজিছে কোণে, গুরু গরজন পশিছে কানে,
আকাশে বাতাসে উঠিয়ে ধুঁয়া, আঁধারে ডুবিছে আলোক মালা।
ধীরে ধীরে পাখী যাইছে নীড়ে; পেছনে আঁধার আসিছে ঘিরে,
অই দেখা যায় অমনি লুকায়, পথিকের চোখে চমকে চপলা।

গৃধিনী শকুনি, শিবা আর কাক, ডাকিছে কৌতুকে শোনা যায় ডাক,
বেতাল ভৈরব চৌদিকে নাচিছে, শাখিনী পেতিনী ভূত প্রেত গুলা।
ঘোর অমাবস্যা অন্ধকার ঘোরে, বিভীষিকাময় এ শ্মশান পাড়ে,
কামনা চন্ডাল শব বক্ষোপরে, বসিয়াছে মনো নিয়ে জপের মালা।
এ শব সাধনা অতি ভয়ঙ্কর, চীৎকারে ফুৎকারে কম্পিত অন্তর,
ভরসা কেবল শ্রীপদে নির্ভর, মুখে মাত্র বাণী ববম্ ববম্ ভোলা ॥

মলয়া-প্রথম খণ্ড

(২)
রাগিণী সুরট মল্লার তাল যদ্

মন মাঝে যেন কার, ডাক শোনা যায়।
কে যেন আমারে, অতি সাধ করে,
হাত দু'খানা ধরে, কাছে টেনে নিতে চায়।
ইঙ্গিতে সঙ্কেতে পলকে পলকে,
কোথা যেতে নারি, পাছে থেকে ডাকে,
শুনে সেই তাণ, চমকে উঠে প্রাণ,
বলে কথা মান, ফিরে আয় আয়।
অবহেলা করি দৌঁড়াইয়া যাই
চৌদিকে নেহারী, কিছু নাহি পাই,
ফিরে এসে কাছে, দেখি হৃদি মাঝে
দাঁড়াইয়া আছে আমার অপেক্ষায়।
হেন প্রাণ বন্ধু হৃদয়ের স্বামী,
কাছে রেখে আমি দূরে দূরে ভ্রমি,
করি কত দোষ, নাহি করে রোষ,
সুজন পুরুষ মাখা মমতায়।
আমি হলে তারি সে হত আমারি,
নিলে তারি মর্ম্ম কাঁটত্ কর্ম্ম ডুরি,
কেন কি কারণ, নিলেনা তার মন,
বৃথা মনোমোহন নামটী ধরায় ॥

মলয়া-প্রথম খণ্ড

(৩)
রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী-তাল মধ্যমান

কেন গো তুই শ্মশানবাসিনী
কোন্ পাগলের প্রেমে পড়ে, হ'লে পাগলিনী।
রক্ত বস্ত্র কটীতলে, নয়নে আগুন ছুটে,
এলো কেশে ছদ্মবেশে উন্মাদিনী কার কামিনী।
কার ভাবে কি ভেবে মনে, যোগিনী যোগ সাধনে,
ঘর ছেড়ে এলে শ্মশানে, ওগো শ্মশানবাসিনী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যারে, যোগে আরাধনা করে,
সে জানি কাহার তরে পাগলিনী নাহি জানি।
চিতা ধূ ধূ ধূ ধূ কুল ত্যাজিয়ে কুল বধু,
মরার মাথায় পিয়ে মধু, আবেশে অবশাঙ্গিনী।
লোল জিহ্বা অসি ধরা, মুণ্ড মালা গলে পরা,
লক্ষ্মী মা তুই লক্ষ্মী ছাড়া, কার লাগিয়া বল মা শুনি।
যা'র লাগিয়ে সে ত ভুলে, পড়ে আছে পদতলে,
মুখে ববম্ ববম্ বলে, আগুন জ্বলে খেলে ফণী।
তবে কেন পাগল পারা, বল মা তারা একি ধারা,
মনোমোহন আত্মহারা, হৃদে ধরে চরণ খানি ॥

মলয়া- প্রথম খণ্ড

(৪)
রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী-তাল মধ্যমান

নমস্তে নিখিল মঙ্গল দায়িনী,
খুল আঁখি দ্বার, সরাও অন্ধকার,
আমি যে তোমায় দেখি জননী।
মলয় মরুতে লতাপাতা কাঁপে,
আড়াল থেকে হাসে ফুল কলি চুপে,
কোকিল কুহরে, শ্যামা দেয় শীস্
মধুকর করে গুন্ গুন্ ধ্বনি।
বনে বন দেবী ভূবন ঈশ্বরী,
মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা তোমারি,
হৃদয়ে হৃদয়ে, সদয়ে নিদয়ে,
জাগিয়ে রয়েছে দিবস রজনী।
মনো মাঝে আছে যত আয়োজন,
তোমারি শ্রীপদে করিতে অর্পণ,
মনোমোহনের মন, অতি উচাটন,
করগো গ্রহণ, ভুবন মোহিনী ॥

মলয়া- প্রথম খণ্ড

(৫)
রাগিণী মনোহর সাই-তাল একতালা

অনন্ত পাথারে ভাসায়ে আমারে, নিতেছে না জানি কে কোথায়।
তরঙ্গে তরঙ্গে, উজান ভাটি রঙ্গে, সঙ্গে নাহি দেখি তায়।
কোথা হ'তে আসি ভাসি লাগে ঢেউ,
পর পাড়ে তার আছে নাকি কেউ,
নৈলে এমন করে হৃদয় ভিতরে,
হাসায়ে হাসায়ে কান্দায়ে যায়।
দূরে দূরে দূরে কত দূরে থাকি,
থেকে থেকে মাঝে মাঝে মারে উঁকি
চঞ্চল আঁখি ঠারে নিমিষে আমারে
ভুলাইয়ে দূরে অমনি লুকায়।
বারে বারে তারে ফিরে ফিরে চাই,
ধীরে ধীরে সরে পাছে পাছে ধাই।
ধরা দিবে বলে, দেই প্রাণ খুলে,
ডাকি বাহু তুলে, আয় আয় আয়।
কাছে আছি বলে, কি জানি কি পেয়ে,
মেতে উঠে প্রাণ কখন হাসি দিয়ে,
কারে ভালবাসে, কেন কান্দে হাসে,
কোথায় আছে সে আমি বা কোথায় ॥
নাহি তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়,
তবু তাঁর লাগি উদাসী হৃদয়,
সে আমারে চায়, আমার প্রাণ তাঁয়
কোথা যেতে জানি তরঙ্গ খেলায়।
পাব বলে তাঁরে আশা করে করে,

ভেসে দেশে দেশে অনন্ত পাথারে।
চলছে মনো ধেয়ে পাবে কোথা গিয়ে
টান দিলে নাকি প্রাণে পাওয়া যায়। **মলয়া- প্রথম খণ্ড**

ডাক্তার নন্দী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে অনেকে ক্ষণজন্মা মনে করেন। যেমন শ্রীমৎ আনন্দ চন্দ্র নন্দী মহারাজ সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া জগতে বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহারই একমাত্র পুত্র শ্রীমৎ মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী ডাক্তার মহাশয়ও প্রতিভা বলে চিকিৎসক হিসাবে, দাতা হিসাবে, সেবক হিসাবে, সাধক হিসাবে ও বিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তা হিসাবে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আপন পর প্রভেদ ছিলনা। জল স্রোতের মত অর্থ তাঁহার হাতে আসিত এবং জগৎবাসীর মঙ্গলার্থে খরচও হইত। গাম্ভীর্য্যে তিনি দৃষ্টান্ত স্থানীয় ছিলেন। সরলতা এবং দূরদর্শিতায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। পিতার গদিতে অভিষিক্ত হইয়া অবধি শেষ পর্য্যন্ত তিনি পিতার আদর্শানুমত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাব পূরণ হইবার নহে। তাঁহার স্নেহ মমতা ভুলিবার নহে। তিনিই ভারতে দেশলাই এর যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন– একটি কারখানাও খুলিয়া ছিলেন। দেশলাই শিল্পের যা কিছু উন্নতি ভারতবর্ষের হইয়াছে তার জন্য দেশবাসী ডাক্তার নন্দীর নিকটই ঋণী। তিনি তাঁতের কলও আবিষ্কার করিয়াছিলেন ছাত্র জীবনেই। তাঁহার কলের কাপড় পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর মহাশয় মাথায় বাধিয়া কলিকাতা শহর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এ ছাড়া সেই যুগে তিনি কালীও তৈয়ার করিয়াছিলেন। তখন তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। হোমিও প্যাথিক চিকিৎসাতেই তাঁহার যশ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তিনি কত রোগীর জীবন বাঁচাইয়াছেন ইহা আমরা অনেকেই জানি।

তাঁহার চিকিৎসার বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিলে যে গ্রন্থ রচিত হইবে, তদ্দ্বারা সকলের উপকার হইবে এবং তাঁহার চিকিৎসার নৈপূণ্য ও দৈব শক্তির পরিচয়ে পাঠক চমৎকৃত হইবেন।

তিনি প্রথমে পিতার প্রতি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আস্থাবান ছিলেন না কিন্তু পুত্র হিসাবে তাঁহার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। পিতার তিরোধান হইলেই তাঁহার অন্তরে ধর্ম্ম পিপাসা এবং অসীম শক্তির প্রেরণা জাগিয়া উঠে। তাঁহাকে তাঁহার পিতৃদেব সময় সময় দেখা দিতেন এবং তাঁহার প্রতি উপদেশ করিতেন। ইহাতেই তিনি পরলোকে বিশ্বাসী হয়েন, 'দয়াময়' নাম সাধনে জীবন ঢালিয়া দেন এবং পরিশেষে সকল ছাড়িয়া পিতার চরণে আত্মসমর্পন করেন। তাঁহার সাধনার বিষয় কার্যপ্রণালী যাহারা জানেন কেবল তাহারাই তাঁহার অলৌকিক আচার ব্যবহার ও লীলা-খেলা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবেন। তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার শ্রীপাদ পদ্মে থাকিবার ও তাঁহার অনন্ত স্নেহ সম্ভোগ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। সংসারে তাঁহার তুল্য মানুষ মিলেনা এবং যে দেশে এমন ব্যক্তির জন্ম হয় সে দেশ তাঁহার আদর্শ লইয়া কার্য্য করিলে স্বর্গে পরিণত হইতে পারে। এই জন্যই তাঁহাকে ভারতের টলস্টয় বলা হইত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সর্ব্ব ধর্ম্ম তত্ত্ব

সর্ব্ব ধর্ম্মার্থী কি কি সত্য মানিয়া চলেন–কি প্রণালী মতে সাধন করেন-কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে এত যত্ন করেন-আমরা আচার্য্য মহাশয়কৃত 'প্রকৃত তত্ত্ব', 'যোগ প্রণালী', 'সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত', 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী'– পুস্তক সকল হইতে সত্য নিরূপণ করিব।

'প্রকৃত তত্ত্ব'

'প্রকৃত তত্ত্ব' গ্রন্থ আকারে অতিক্ষুদ্র। পঞ্চ পঞ্চাশতটী বিষয় এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয়ের লিখিত উক্তি– "এই পঞ্চ পঞ্চাশতটী বিষয় জগতের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সন্দেহ নিরাকরণার্থে যতই উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইবে ততই সাধ্য সাধনার যোগ মনুষ্য মনে প্রকাশিত হইয়া জীবন সংশোধন করতঃ ধর্ম্ম জীবনে পরিণত করিবে– এই ধারণা আমার মনে প্রবলভাবে বিরাজ করিতেছে"।

প্রকৃত তত্ত্বের বিষয়–

১। ধর্ম্ম বীজ।
২। আত্মা এবং শরীর এক।
৩। মনুষ্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন।
৪। শুভাশুভ উভয়ই মঙ্গল।
৫। কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই।
৬। সাম্প্রদায়িকতা।
৭। কেমন ব্যক্তি গুরু হইতে পারে ?
৮। সাধু সঙ্গ ও গুরু পরিচয়।
৯। সকলই পবিত্র।

১০। স্বর্গ ও নরক।

১১। জন্ম একবার।

১২। বন্ধু বিয়োগের পর কার্য্য।

১৩। যে বস্তু অথবা ব্যক্তি দ্বারা শোক ও দুঃখের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, সে সকলের দ্বারাই আবার তাহা নিবারিত হইবে।

১৪। প্রতিকূল ও অনুকূল ব্যাপারের একতা দ্বারা সিদ্ধি যোগ উপস্থিত হইবে।

১৫। আমি তুমি ঐক্যতার বিরোধী।

১৬। লৌকিক ও অলৌকিক ব্যাপার উভয় একই শক্তির পরিচয় দিতেছে।

১৭। পূর্ণ সিদ্ধ অবস্থা না হওয়াতে সাধকের বাক্যে ও কার্য্যে অবিশ্বাসের কারণ হয়।

১৮। প্রতিকূলতা ও অনুকূলতা সকলই ঈশ্বরের মধ্যে আছে।

১৯। প্রবৃত্ত, সাধক, সিদ্ধাসিদ্ধ ও সিদ্ধ।

২০। কোন ধর্ম্মাবলম্বী বিপথগামী নহে।

২১। প্রচারক ও আচার্য্যের কার্য্য।

২২। স্ত্রী ও পুরুষের যোগ সকলের মূল।

২৩। একাকী সাধনের ইচ্ছা অর্দ্ধ যোগ মাত্র।

২৪। ধর্ম্মাধর্ম্ম।

২৫। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমৎ স্বরূপের মধ্যে সর্ব্ব স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে।

২৬। প্রতিকূল অনুকূল উভয় ব্যাপারকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবে।

২৭। ধ্যানের অধিকারী।

২৮। ধ্যানের পূর্ব্ব কার্য্য

২৯। যে ভাবে ধ্যান করিলে আংশিক রূপে ধ্যান দ্বারাও সার তত্ত্ব জানা যাইতে পারে।

৩০। আচার্য্য হইতে সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ দ্বারা নামের যোগ শেষ করিয়া ধ্যানের অধিকারী হইবে।

৩১। রোগাদি প্রতিকারের জন্য ঔষধাদির প্রয়োজন নাই।

৩২। রোগাদি ক্লেশের দ্বারা মনুষ্যের সাধন সাধ্য হইতেছে।

৩৩। সকল নামের যোগ একটি নামেতে আছে।

৩৪। ভূত প্রেতাদির রূপ ও ঈশ্বরীয় রূপ।

৩৫। স্বপ্ন বৃথা নহে।

৩৬। স্বপ্নের প্রকার ভেদ।

৩৭। গৃহ ধর্ম্ম ছাড়িয়া স্বর্গ লাভ অসম্ভব।

৩৮। ইন্দ্রিয় সেবাতে অতীন্দ্রিয় যোগ।

৩৯। সর্ব্ব ধর্ম্মের ঐক্যের নিমিত্তে বিশেষ লোক একজন আসিবেন।

৪০। স্বাধীনতা।

৪১। জাতিগত পার্থক্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক মিল।

৪২। সকল বস্তুই এক বলিয়া বিশ্বাস করা অযুক্ত নহে।

৪৩। বৃদ্ধিই জগতের লক্ষ্য।

৪৪। মনের যোগ শেষ হইলে ঈশ্বর দর্শন লাভ হইবে।

৪৫। সাধকতা।

৪৬। ঈশ্বরীয় যোগ লাভের পূর্ব্বে একবার সংসারের অকুশল অনিবার্য্য।

৪৭। পরলোক।

৪৮। বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ লাভ না করিলে সাধনের কার্য্য শেষ হইতে পারেনা।

৪৯। ঈশ্বর বাণী হৃদয়ে প্রকাশিত হওয়ার প্রকারভেদ।

৫০। ঈশ্বর-দর্শন।

৫১। যে নিয়মে দর্শন ও শ্রবণ পর্য্যায়ক্রমে উন্নত হইতে থাকে।

৫২। বাণীর যুক্তভাব ও যুঞ্জানভাব ইহার মধ্যে যুঞ্জানভাব সাম্প্রদায়িকতার মূল।

৫৩। জগতে একজন সুখী ও একজন দুঃখী দেখা যায় কেন।

৫৪। প্রকৃত বিবাহ।

৫৫। মুক্তি।

যোগ-প্রণালী

বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ

যোগের প্রয়োজন– নামেতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্ব সমীপস্থ সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বরকে হৃদয়ে উপলব্ধি করা এবং উত্তরোত্তর শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁহার মধ্যেও একমাত্র তিনিই তাঁহার মধ্যে কার্য্য করিতেছেন সন্দেহ রহিত হইয়া বোধ করা জীবন মুক্তির আদর্শ। রোগ, শোক ও মৃত্যু রহিত হওয়ার নিমিত্ত এই আদর্শের দিকে চলিয়া যাওয়াই যোগের প্রয়োজন।

সামীপ্য যোগ

সুখময় সমীপবর্ত্তী ঈশ্বর সদয় হইয়া শক্তিশালিতা অর্পণ করুন; এই প্রার্থনা করিয়া একবার ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা– 'জগত করতলে দয়াময় হৃদয়ে"। ধ্যানের পর ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া– "সর্ব্ব শক্তিমৎ" এই স্বরূপ মনে করিয়া "তুমি দয়াময়" এই বলিয়া নমস্কার করিবে।

সাকল্য যোগ

যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বম্ ভুবনমাবিবেশ যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ। তদেব সর্ব্বশক্তিমৎ। (সমস্বরে)

সামীপ্য যোগ শেষ হইয়া হৃদয় গ্রন্থি মুক্ত হইল, আর তোমাকে জগতের প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে উপলব্ধি করেন।

অধীনতা দূর হইয়া গেল, বুদ্ধিমত্তা ও সুখ প্রবণতা হৃদয়কে অমৃতায়মান করিল।

ধ্যান– স্পর্শ মণি স্পর্শ করিলাম হৃদয়ে দয়াময়।

কৈবল্য যোগ

আমার অহঙ্কার তোমাতেই বিলীন হইয়া গেল। তখন দেখি চতুর্দ্দিকে তুমি, হৃদয়ের মধ্যে তোমারই লীলা, হস্ত পদাদি দ্বারা তুমিই কার্য্য করিতেছ। তুমিই কেবল, কেবলই তুমি, আর কিছুই নাই। ধ্যান যথা– তোমার মধ্যে জগৎ জগতের মধ্যে তুমি, এজন্য তুমি হৃদয়ে।

শেষ যোগ

শেষ যোগে মনের আনন্দ উপস্থিত হইয়া ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য জগতকে এই আনন্দের অংশী করিবার নিমিত্ত এবং জগতের মঙ্গলার্থে প্রার্থনার ইচ্ছা হইয়া থাকে।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোহদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকাণাম্ ॥

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপা বিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥
তদেকং স্মরাম স্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎসাক্ষীরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরাবলম্বমীশং
ভবাম্ভোধি পোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

(১ বার)

শেষ যোগ

প্রার্থনা (সমস্বরে)

হে দয়াময় করুণা-সিন্ধো! তোমার এই জগৎ রাজ্যের সমুদয় অমঙ্গল দূর করিবার নিমিত্ত যে সকল আয়োজন করিয়াছ তাহাতে জগতবাসীদিগের মনের আনন্দ উদগম কর। তোমার শান্তি-রসাস্পদ ক্রোড়ে ইহলোক ও পরলোকবাসী বিরাজ করিতেছে তাহাদের মধ্যে যাহারা অগ্রে তোমার মঙ্গল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে একত্রে মিলিত কর এবং অন্য কোন প্রতিকারের প্রতি মনের ভাব না রাখিয়া সকল প্রতিকারই তোমার নামের মধ্যে প্রবেশ করে ইহার বিশেষ উপায় বিধান কর। প্রভো! তুমি যে অদ্বৈত কারণ এবং কার্য্য উভয়, ইহা বিশেষভাবে আমাদিগকে বুঝিতে দাও। তোমাকে না জানিয়া তোমার সহিত যোগ অসম্ভব। দয়াময়! তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।

রাগিনী আলাইয়া-তাল ঝাঁপ

যম যন্ত্রণা দূর করি সকল লোকে,
করহে প্রীতির পূর্ণ ছবি।
উপায় নাহি দেব তব চরণ রজ বিনা সেবনে,
ঘোর বিপদে নিস্তার সারবত্তা দাওহে অধীন জনে,
মুরতি মোহন রবি।
সকল নাম এক যোগে দয়াময় নামে দেহ কারণ বারি,
অবিনাশি সিদ্ধযোগে হৃদি বিলাস ভবনে,
তব আবির্ভাব পূর্ণভাবে লভিতে উপায় করহে সত্বর,
প্রেম লভিবে মানব মানবী।
ইহ পরলোক সকলে বিবাদ কলহ দূর করি,
একতানে তব নাম, মাধুরী জীবনে আন,
সকল জীবে করিবে হিত এই রসাল সাধনে,
তৃপ্ত হইবে মধুর নাম, আনন্দে গাইবে সকল কবি।

(সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত- ১ম ভাগ)

উপদেশ

বিষয় অবিষয় সিদ্ধযোগে মিলিত হইয়া যাইবে। আজীবন ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া থাকিবার জন্য যে সকল উপায় আমাদিগের আছে তন্মধ্যে স্ত্রী পুরুষের যোগই মূল। এই দুইয়ের মধ্যে জগত তিষ্ঠিয়া রহিয়াছে। অবিষয়ের যোগ শেষ হইলে বিষয় অবিষয় এক হইয়া সংসার স্বর্গ উভয় এক হইয়া যায়। সস্ত্রীক দয়াময় নাম সাধনই অবিষয়। এই অবিষয় যোগে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব প্রতিকার ইহারই মধ্যে নিবেশিত কর; দেখিবে অচিরে জীবন মুক্তির পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হইবে। তোমার সমস্ত লীলার ভাব এক দয়াময় নামের মধ্যে

নিবেশিত করিয়া পরিত্রাণের দ্বার বিশেষরূপে মুক্ত করিয়া দিলে, ইহা সকলকে বুঝাইয়া দাও।

জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়

শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

"সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত"

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত **১**ম ও ২য় ভাগ গ্রন্থদ্বয়ের অধিক সংখ্যক **১২৯১** সালের প্রাত্যহিক উপাসনার সময় লিখিত হইয়াছে। বাকী অন্যান্য গানের কোন কোন গান শারদীয় ব্রহ্মোৎসবের সময়, কোন কোন গান বিশেষ কোন ঘটনা প্রসূত এবং কোন কোন গান কোন শিষ্যের আবেদনে বা উপকারার্থে সাধনার ভিতর দিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। যেমন–

১। শারদীয় ব্রহ্মোৎসব- আশ্বিন **১২৮৪** সাল

"দয়াময় নাম শান্তি সুধা সমুদ্র মন্থনে এল ভুবনে"।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত- **১**ম ভাগ

২। শারদীয় ব্রহ্মোৎসব-**১২৮৯** সাল

"মধুময় হইল সংসার বল মুখে দয়াময়"

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-**১**ম ভাগ

৩। স্বামীজী একবার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার হৃদয়ে বৃন্দাবনী ভৈরু রাগিনীতে–

"জয়দেব দয়াময়। বিকশিত কুসুম নবঘন অনুপম।"

...এই আরতিটি প্রকাশিত হয়।

৪। শ্রীমৎ স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য শ্রীল রাম দয়াল দাদা (বাড়ী শ্রীরামপুর নবীনগরের নিকট জিলা-কুমিল্লা অধুনা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) একবার তাঁহাকে ব্যাকুলতা জ্ঞাপন করেন- বাবা বৈষ্ণব ভক্তেরা আরতি করেন।

সকল ধর্ম্মেই আরতি হইয়া থাকে। আমরা কি সন্ধ্যারতি করিবনা? তাহার সমক্ষেই স্বামীজী "প্রেম সিন্ধু হরি ওঁ জয় দয়াময়" এই কীর্ত্তন রচনা করিয়া দেন। ইহাই সন্ধ্যারতির পূর্ব্ব ইতিহাস।

৫। "সবে বল জয় জয় দয়াময়ের জয়" এই আরতিতে "আল্লা করিমের জয়" এই মুসলমানী পদ থাকায় কোন শিষ্যের আরতি কীর্ত্তনে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় স্বামীজী মহারাজ "জয় শিব হরি কৃষ্ণ কালী দয়াময়" এই কীর্ত্তনটী রচনা করিয়া দেন।

৬। রামশরণ নামক জনৈক শিষ্যের স্ত্রীর সদ্ভাব হওয়ার জন্য "ডাকলে দেখা দেয়না কাঙ্গাল বলিয়ে"

এরূপ বহু সঙ্গীত বহু ঘটনা বা ভাব উপলক্ষ করিয়াই রচিত হইয়াছে।

উক্ত সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত গ্রন্থদ্বয়ের সঙ্গীতগুলি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবু দ্বিতীয় সংস্করণে যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সঙ্গীত বহির প্রথম সংস্করণের কোন ভূমিকা দেওয়া হয় নাই। সেই সময়ে ভূমিকা লিখিবার কথা আমার মনেও আসে নাই। কারণ এই সকল সঙ্গীত মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি যোগে প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ঈশ্বরীয় বাণী জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা এই সকল সঙ্গীত লিখিত হওয়ার সময় বাবার সম্মুখে বসিয়া দেখিয়াছে তাহারা আমাকে বলিয়াছে এই সকল সঙ্গীত লিখিবার সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন এবং চক্ষুর সাহায্য ব্যতিরেকেই তাঁহার হস্ত এই সকল সঙ্গীত লিখিয়া যাইত। এই সকল সঙ্গীতের কোনটাতেই তাঁহার নিজ নামের ভণিতা নাই বরং কোন কোন সঙ্গীতে তাঁহার যে কোন শিষ্যকে উপলক্ষ করিয়া সঙ্গীতটী লিখিত হইয়াছিল তাহারই নাম ভণিতার মধ্যে আছে। এই সকল গানের অধিক

সংখ্যক ১২৯১ সনে প্রাত্যহিক উপাসনার সময় লিখিত হইয়াছে। ১২৯১ সনের ২৮শে ভাদ্র উপাসনার সময় যে গান রচিত হইয়াছিল সেই গানটী এই বহির প্রথমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের গান সকল প্রথম ভাগের শেষ অংশে লিখিত আছে। ১২৯১ সনে এইরূপে লিখিত উপাসনা এবং সঙ্গীতকে "সাধন তত্ত্ব" নামে নিজেই নামাকরণ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল সঙ্গীত অধ্যাত্ম ঈশ্বরীয় যোগের সঙ্গীত কিঞ্চিৎ পরিমাণেও যোগ যুক্ত না হইয়া কেবল ভাষা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা বুঝিয়া লওয়া অসম্ভব, একটি গানেতে লিখা আছে–

"কুশাগ্রীয় বুদ্ধি যারা ভ্রমেতে পড়িল তারা,
জানিল না বুদ্ধি হারা, হ'ল মা তোমার কারণ।"

(সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত ১ম ভাগের ১৫২ নং গান)

বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া কাহাকেও এই সকল সঙ্গীতের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং ঐ চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা ইহাই বলিতে পারি যে নাম জপ দ্বারা হৃদয় ঈষৎ উন্মোষিত হওয়ার পূর্ব্বে এই সকল সঙ্গীতের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি নাই; এবং আমার মনে হয় নাম জপাদি দ্বারা ঈশ্বর প্রেম কিয়ৎ পরিমাণে লাভ না করিলে এই সকল সঙ্গীতের মর্ম্ম কেহ কিছু বুঝিতে পারিবেন না।

শ্রী মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী

সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী

উপাসনার হিসাবে যে মহাগ্রন্থের সূচনা হইয়াছিল, উহাতে ১৩০৬ বাংলা সালের চৈত্র মাসের ৩০শা পর্য্যন্ত দৈনিক উপাসনা লিখিত আছে। প্রায় সকল কথাই স্বামীজীর নিজ হাতের লেখা। তবে প্রথমাংশের কিছুটা লেখা অন্যের বলিয়া মনে হইতেছে; শেষাংশে বোধ

হয় এরূপ অন্যের লেখা বিষয় আছে। ইহার কারণ এই হইবার কথা যে, তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণের কেহ কেহ হয়তঃ শ্রীমুখের আদেশেই তাঁহার বর্ণিত সত্য বা উপাসনা লিখিয়া রাখিতেন। সকল দিগের হিসাবে এই গ্রন্থের নামই তিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী রাখিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

উপাসনার প্রণালী

আমরা শ্রীশ্রীমৎ আনন্দ স্বামীজীর জীবনে কোন দিন তিনি যে উপাসনা করিতেন উহাতে যোগ দিতে পারি নাই। তিনি তাঁহার শিষ্য সেবকদিগকে উপাসনার উপদেশ দিতেন, তাহাদিগকে দেখিয়াছি- কেহ কেহ আমার সঙ্গীও হইয়াছেন। ইহাদের ধর্ম্ম সাধনা এবং স্বামীজী মহারাজের লিখিত ধর্ম্ম গ্রন্থের উপাসনাই একমাত্র আমাদের অবলম্বন। সুতরাং তাঁহার উপাসনা প্রণালী কিরূপ ছিল, কি প্রকারে উপাসনা প্রণালীর উপদেশ তিনি করিতেন- সকল বিষয়ের ধারণা অন্য কোন রকমে করিয়া উঠিতে পারি না। তিনি যেরূপ উপাসনা করিতেন এবং তাঁহার আদর্শ ভক্তজনেরা যেরূপ উপাসনা করিতেন এবং তাঁহার আদর্শ ভক্তজনেরা যেরূপ উপাসনা করেন এবং আমরা যে ভাবে উপাসনা করি, সকল উপাসনার মধ্যেই একটি সত্য ধারা রহিয়াছে-ব্যক্তিগত ভাবে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে। আমরা দেখিব, এই উপাসনার সম্পর্কে তিনি অন্যকে কি বলিতেন,- নিজেই কি রকম পন্থা অনুসরণ করিতেন। সাধন বিষয়টা স্বভাবের নিয়ামক নহে ইহা কেহ বলিতে পারেন না। শুদ্ধ সরল প্রার্থনাতেও হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া পড়ে- পুণ্যের উৎস উছলিয়া উঠে। স্বতঃ প্রেরণায় মনের আবেগে ঈশ্বরোপসনার তরঙ্গে মজিয়া মানব সিদ্ধ নির্ম্মল ভাব উপভোগ করে, জন্মের শত দুঃখ মুহূর্তের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়া পড়ে এবং কর্ম্মের শত সহস্র গ্রন্থির বন্ধন খসিয়া যায়। এজন্য উপদেশ বিনাও আমরা উপাসনা করিনা এমন নহে। সাধারণ লোকেরাও উপদেশ না পাইলেও দুঃখে দারিদ্র্যে ক্রন্দন করে এবং ঈশ্বরকে মনে করিয়া কাতর প্রার্থনা করে। ইহাও উপাসনা ইহাও সাধনা। সন্ন্যাসীরা স্তব স্তুতি করে, কীর্ত্তন করে ও আত্মোন্নতির পথ খুঁজিয়া বেড়ায়, তাঁহাদের ইহা উপাসনা।

সুতরাং উপাসনার অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে, যিনি ঈশ্বর চিন্তা পরবশ হইয়া হৃদয় খুলিয়া দেন, আপন মনে কাতর প্রাণে সকল কথা ঈশ্বরকে বলিতে পারেন, তিনিই উপাসনা করেন। সম্মুখে রাজা আছেন, প্রজার বিনয় নম্র ও ভীতি বিহ্বল বিচলিত নিবেদন হইতেছে, ইহাও এক প্রকার উপাসনা। সুতরাং ঈশ্বরের কাছে এভাবে নিবেদন করিতে পারিলেও উপাসনা হইতে পারে। তথাপি প্রজা ও রাজা, ভক্ত ও ভগবান, ইহাদের পার্থক্য রহিয়াছে। প্রজাও ভয়ে ভয়ে মহারাজকে দুঃখ যন্ত্রণার আবেদন করে কিন্তু ভক্ত তাঁহার ভগবানের সহিত হৃদয় খুলিয়া দিয়া নিবেদন করেন। সুতরাং হৃদয় ঢালিয়া দিয়া ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণা, কীর্ত্তন, মনন প্রভৃতি কার্য্য করাকেই উপাসনা বলিতে পারি। সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালীতে স্বামীজী মহারাজের উক্তি আছে–

“হৃদয়ে সরল ভাবে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস ও আত্ম সমর্পণপূর্ব্বক জীবনের সমুদয় ভার তাঁহাতে অর্পণ করা ও তাঁহার হওয়ার নিমিত্ত তাঁহার নিকট যে প্রার্থনা তাহাই প্রকৃত উপাসনা।”

দু এক জন ধর্ম্ম বন্ধুকে দেখিয়াছি, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ভোরে কি দুপুরে কিংবা রাত্রিতে সামান্য ২/১টি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ও নির্দ্দিষ্ট কোন স্তব পাঠ করেন। ইহাই তাঁহাদের জন্য স্বামিজী মহারাজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এক বেলাই সঙ্গীতাদি করেন,– কেহ আবার তিন বেলাই উপাসনা করেন–জপ ধ্যানের কার্য্য করিয়া থাকেন–সময় সময় উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনাদি করেন। ইহা তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট জপ-ধ্যান-প্রার্থনা নহে-আদেশ প্রত্যাদেশের ভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে উপস্থিত প্রেরণা। কেহ কেহ দেখিয়াছি শুধু প্রার্থনাই করেন। এভাবে অনেকে অনেক রকমেই সাধনে আছেন। এ সমুদয় ভক্তের চরিত্রে বা আচরণে যে সকল ব্যাপার দর্শন করি, সে সমুদয় এবং

আরো অসংখ্য বিষয় এক স্বামিজীর জীবনে রহিয়াছে, ইহা তাহার নিজের লেখা সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্বে দেখিতে পাই, সুতরাং স্বামিজীর উপাসনা প্রণালীই এস্থলে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব, যেন ইহাতে স্বামিজীর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সম্যক ধারণা হইতে পারে।

তিনি প্রাতঃকালে উপাসনা করিতেন, ইহার বিবরণ 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী' নামক পুস্তকে আছে। মধ্যাহ্নের উপাসনার বিবরণও কতক এ বিশেষ গ্রন্থে দেখিতে পাই। রাত্রির উপাসনা, বৈঠকের উপাসনা, বিবাহের জন্য উপাসনা, রোগের জন্য উপাসনা, শোক প্রশমনের উপাসনা, সংসার বাসনা এরূপ অসংখ্য উপাসনা– এ বহিতে লিখা আছে। সত্য সকল পথেই তাঁহার নিকট আসিয়াছিল– এজন্যে তাঁহাকে সর্ব্ব ভাবেই উপাসনা করিতে দেখি। বাস্তবিক, সকল বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তি উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বর সগুণ নির্গুণ উভয় প্রকারে মানুষের অন্তরে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং সঙ্গীত, কীর্ত্তন, জপ, আরাধনা, প্রার্থনা, স্মরণ, মনন, ধ্যান, উপদেশাদি সকল পথেই আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারেন। তাঁহার ইয়ত্তা নাই, তিনি এক এবং অনন্ত সত্য স্বরূপে বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে ডাকিতে হইলে, তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার দর্শন করিতে হইলে যে ভাবে পার সে সেভাবেই কার্য্য করিবে। তিনি যাহাকে বরণ করিবেন, তিনিই তাঁহার কৃপা লাভে ধন্য হইবেন। সত্য বলিতে গেলে তাঁহাকে চিনিবার যো নাই, তাঁহার কৃপা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। সাধক কৃপার আশে চিরদিন কর্ত্তন করিতে পারে, সিদ্ধ জীবন লাভে কোটী বৎসর লাগিতে পারে, তবুও তার বিরতি নাই, তিনি সেই সত্যের অভিমুখে অবিরাম অগ্রসর হইবেন। যার হৃদয় বলহীন তাহার সাধনের শক্তি নাই জানিবে। তাই কঠোপনিষদে উক্তি রহিয়াছে,– "নায়মাত্মা বলহীনেন্ লভ্য।"

এক্ষণে স্বামিজীর ধর্ম্ম গ্রন্থে আন্দোলন যে ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে উহাই এ গ্রন্থে উল্লেখ করিতেছি। তিনি আদেশ পাইতেন, ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতেন, প্রয়োজন পড়িলে কঠিন সমস্যার সমাধানও তাঁহার 'দয়াময়ের' কাছে জানিতেন। এজন্যে বলিতেছি, তিনি উপাসকের উপযোগিতা পাইয়াই উপাসনা করিতেন। তবে সাধারণ শিষ্যদিগকে কি তিনি উপাসনা করিতে বলেন নাই? বাস্তবিক, তিনি উপাসনার কথা সকলকে বলিয়াছেন এমন মনে হয় না। তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গেরাও এরূপ বাক্যের সমর্থন করেন না। তবে সাধারণ ভাবে সকলকেই প্রাতে ও সায়াহ্নে আরতি করিতে উপদেশ দিতেন। এই আরতির পথে উপাসনারই প্রকারান্তর কার্য্য বিধি রহিয়াছে। সাধন করিলে সহজে বুঝিতে পারিবে যে, এই আরতির ব্যাপারেও মহোচ্চ সাধন সত্যরূপে প্রকাশিত আছে। সর্ব্ব সাধারণের জন্যে তিনি জপই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। যে নাম যার জন্য প্রয়োজন, ঈশ্বর হইতে জানিয়া উহার উপদেশ করিতেন। সুতরাং এরূপ কেহ রাত্রিকালে কেহ বা দিবাতে-কেহ বা দিবারাত্রি উভয় সময়েই নাম জপ করিতেন। এই নামের সংখ্যা তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। কত মাস কি দিন বা বছর এই নাম জপ করা দরকার হইবে- তিনি জানিয়া বলিয়া দিতেন। এইরূপেই তিনি সাধারণের ব্যবস্থা করিতেন। এ ভাবে দেখিতে পাই সাধারণের জন্য উপাসনা নহে, জপই সর্ব্ব সাধারণের কার্য্য বিহিত হইয়াছে।

প্রার্থনার প্রয়োজনও সকলের জন্য হইতে পারে– এমন দেখি নাই। জপ সকলের জন্য প্রথমে নির্দ্দিষ্ট হইবে- প্রার্থনা প্রয়োজন পড়িলে দেওয়া হইবে, ইহাই বিধান ছিল বুঝিয়াছি।

কাহারো কাহারো জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট গান করিবার উপদেশ থাকিত। ভোরে উঠিয়া বা সন্ধ্যায় বসিয়া করিতে হইবে। ইহাই তাহার সাধনের

বিষয় ছিল– জপও সময়মত সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে। এজন্যে দেখি কেবল পাত্র ভেদে তিনি ব্যবস্থা করিতেন। এক ধর্ম্ম গ্রন্থে পড়িয়াছি, কোন সিদ্ধ মহাজন উপদেশ করিয়াছেন– গুরু ভব রোগের চিকিৎসক। তিনি সকল রোগীর জন্য একটী মাত্র ঔষধ ব্যবস্থা করিতে পারেন না। যার যেমন আবশ্যক, তার তেমন ব্যবস্থাই তিনি করিয়া থাকেন, তিনি অন্তরের চিকিৎসা করেন। কাজেই তাঁহার চক্ষুর সমীপে স্বর্গ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত শিষ্যের উপযুক্ত অবস্থা তিনি দর্শন করেন ও ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন ভৃত্যের মত শিষ্যের জীবন গঠনে নিযুক্ত থাকেন।

স্বামিজীর অন্তর্ধানের পরে আমি তাঁহাকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হই। এ ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া অবধি অনেকের কাছে গিয়াছি, জানিয়াছি, সকলেই তাঁহার উপাসনার বিভিন্ন প্রণালী অগণ্য প্রকারের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অধিকারীদের জন্যই উপাসনা ইহা বুঝিতে পারা যায়। যিনি সাধন ভজনে উন্নতি করিয়াছেন কিংবা ঈশ্বর দর্শনের পথ যাহার অন্তরে খুলিয়াছে– যে ব্যক্তির মানস নেত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সত্যের আলো ফুটিয়াছে, যিনি দর্শন ও বাণীর কার্য্য লাভ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তিই উপাসনা করিতে পারেন। সাধন পথে সচরাচর যে ব্যক্তির জীবনে এইরূপ উপযোগিতা যে, তাঁহাদের হৃদয়ে সকল প্রশ্নের মীমাংসাই বাণীতে জানা যাইতেছে, এমন ব্যক্তিও উপাসনা করিতে পারেন। মোট কথা 'সামীপ্য' সাধন পূর্ণ হইলেই উপাসনার সম্বন্ধে সোজাভাব হইতে পারে, তবে সাধারণ বাণীর ভাব যে সকল ব্যক্তির মধ্যে কার্য্য করিতেছে, তাঁহারা আদেশ বুঝিয়া প্রয়োজন মত উপাসনা করিবেন।

স্বামিজীর উপাসনা বিচিত্রভাবে পূর্ণ ছিল। কোনদিন তিনি উপদেশ দিয়াই তাঁহার উপাসনার কার্য্য পরিসমাপ্তি করিতেন, কোনদিন আবার সুদীর্ঘকাল কীর্ত্তন, ধ্যান, প্রার্থনা ও জপ করিতেন; কোন বেলায় শুধু

গানই হইত-ইহাতেই উপাসনার সমাপ্তি দেখা যাইত; কোনদিন বক্তৃতা, ধ্যান ভিন্ন কিছুই উপাসনার কার্য্য ছিল না। এভাবে সাধারণতঃ তিন ভাবেই উপাসনা হইতঃ ১) ধ্যানই তাঁহার উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল, ২) তিনি প্রার্থনাও উপাসনার অঙ্গ মনে করিতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন কি গানও করিতেন। ৩) ধ্যান ভিন্ন জপাদিও করিতেন। নিম্নে স্বামিজীর উপাসনা কয়েকটী সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী নামে যে গ্রন্থ রহিয়াছে উহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক উহাদের পাঠে তাহার প্রণালী বুঝিতে পারিবেন।

(১)
২৯শে আষাঢ় শনিবার- ১২৯১ বাং

মনের অনুরাগ পূর্ণ হইবার জন্য আজ দয়াময় পূর্ণ ভাব দেখাইলেন। দেখ দেখ একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া, কে তোমাদের কার্য্য সুখ দিতেছে। আজ অপরাজিত বরণী মাতা উভয় পিতা এবং পুত্রকে কোলে লইয়া দয়াময়ের সাক্ষাৎ উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন শুন দয়াময় তোমার কার্য্য বড় কঠিন। তুমি মনের আশা পূর্ণ করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছ। কিন্তু কার্য্য কর্ম্ম নিতান্ত কঠিন ভাবে চলিতেছে। স্বচ্ছলতা না হইলে আমার পুত্রদিগের এবং কন্যাদিগের মঙ্গল হইতে পারে না। এজন্য তোমার নিকট বলিতেছি আমার পুত্র কন্যার মঙ্গল যাহাতে শীঘ্র হয় তাহা তুমি কর। জগন্মাতার এই কথা শুনিয়া দয়াময় বলিলেন শুন প্রিয়ে তোমার সাধ পূর্ণ হইতে এখনও বাকী আছে। তুমি অসাধনে দিন কর্ত্তন করিয়া জীবন যাপন করিয়াছ; আমি তোমার কার্য্য কর্ম্ম বিশেষরূপে করিতে পারি নাই। এই জন্য করিতে পারি নাই যে জগতে নিরঞ্জন রূপ লইয়াই আমি অকাতরে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ উভয় ভাবকে বরং দুঃখের ভাবকে অধিক পরিমাণে পোষণ করিয়াছি। এই জন্যই তোমার বিশেষ ব্যাপার সাধিত

হয় নাই। আজ তাহা হইবে বলিয়া তোমারও মনের বিশেষ ইচ্ছা দেখা যায়। আমিও তৎপক্ষে নিতান্ত মনোযোগী হইয়াছি, এখন কর্ত্তব্য অবধারিত এই হল যে তুমি জগতে তোমার কন্যাদিগকে অগ্রে জাগরিত করিয়া আমার নামে দীক্ষিত কর। তৎপর পুত্রেরা আসিতে আর বিলম্ব হইবে না। আমার নামে যাহারা এখন অবধি দীক্ষার ভাব পাইবে তাহারা কোন প্রকারেই আর যন্ত্রণা ভোগ করিবে না। তুমি মাতা হয়ে কন্যাদিগকে এবং স্ত্রী হয়ে পুত্রদিগকে নামের যোগ দান কর। দয়াময় এই কথা বলিয়া একটী কাল বর্ণের ছবি প্রকাশ করিলেন। দেখাইলেন এই ছবির মধ্যে চরাচর বিশ্ব সংসার। রোম কূপে সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড, সেই অনন্ত ভাব দেখিয়া মাতা অস্থির হইলেন। বলিলেন, তোমার মুখ আমি আর দেখিতে পারিনা। আমার শরীর মন অবশ হইয়া গেল এই রূপ সম্বরণ কর। নতুবা আমাকেও ইহার সহিত যুক্ত কর। এই বলিয়া অচৈতন্য হইয়া মাতা ধরাতলে পড়িলেন। মাতা শূন্য যোগ লাভ করিলেন, পিতার হৃদয়ে সর্ব্ব সাধন পাইলেন কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এই লীলার পর কার্য্য আরম্ভ হইল এমন ভাবে যে মানুষ আর পক্ষী গমনাগমন বিষয়ে সমান হইয়া গেল। মাতা তখন মহাসুখে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য মধুময় রূপ দেখাইলে জনক জননী। হরি হরি হরি মৃদুভাষিণী মাতা তখন পিতার গলায় বরণ মালা দান করিয়া বলিলেন এতকাল আমাদের বিবাহ হয় নাই এখন তাহা হল। পুত্র কন্যারাও ইহার ফল অচিরে লাভ করুক মাতা পিতার এই যোগ অতীব সুন্দর ও মনোহারী। এই মনোহারী ব্যাপার হৃদয়ে দয়াময়কে আনিল এই ধ্যান কর।

গান

রাগিনী বিভাস–তাল আড়া

বিরস বদন তোমার সরস দেখিব কবে।
কারে কব মনের ব্যথা কে শুনিবে আত্মভাবে ॥
লোচন সজল তব, দেখি করি অনুভব,
কারণ আছে কৈতব পিতার হৃদয়ে তবে।
যদি পাই মা অনুগ্রহ, দেখি তব সুবিগ্রহ,
প্রাণপণে করি আগ্রহ, পিতার চরণ সেবে।
রাজ্যে সুখ আর পাব কোথা, তব চরণে সর্ব্বথা,
মন রাখ ঘুচাও ব্যথা, তব কার্য্যে এই ভবে।
মঙ্গল কুশল যত, তোমার হৃদয়ে সতত অনুকূল পিতৃব্রত,
কর মা প্রেম সম্ভবে। সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ

আমাদের আজকার উপাসনার এই একটী সার কার্য্য যে আমরা মাতার প্রতি বিশেষ সদয় ভাব সতত রাখিব। মাতার জন্য দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করিব। মনের আশা পূর্ণ হল দয়াময় হৃদয়ে আসিল এই ধ্যান কর। মনমসি দূরে গেল বিকার হইল ক্ষয়, এই কথা মাতার মুখে শুনা গেল। তাহাতেই জগতের কল্যাণ আজ বিশেষ রূপে আসিল বুঝা গেল।

মাগো তুমি দয়াময়ী। তোমার প্রেম সামীপ্য, সাকল্য, কৈবল এই তিনের একাধার আমাদের হৃদয়কে এই প্রেমে পূর্ণ কর। তুমি দয়াময় ৩ বার। দয়াময় দয়াময়ী একযোগে দয়াময় হৃদয়ে এই ধ্যান কর। দয়াময় তুমি ৩ বার। সকল কার্য্যপূর্ণ কর। মাতার প্রেমে বিশেষ যোগদান কর।

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক

॥ জয়ধ্বনি ॥

(২)

৩রা বৈশাখ শনিবার ১৩০৪ বাং

রাত্রিতে বৈঠক

"সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়" ১০০ জপ ও ১ বার ধ্যান সকলে কর– "নমো নারায়ণ পূর্ণ দয়াময়" এই নমস্কার, কার্ত্তিক পূর্ণিমার সাধন সিদ্ধ হইল, বিষয় গরলামৃত একযোগে কার্য্য আরম্ভ করিল। অসিদ্ধি রহিত হইয়া গেল।

"জয়দেব দয়াময়" ১০০ জপ কর। "নমো হরি চৈতন্য জয় দয়াময়" এই নমস্কার।

॥ জয়ধ্বনি ॥

(৩)

৫ই বৈশাখ, সোমবার ১৩০৪ বাং

রাত্রিতে বৈঠক

[রাত্রি ৯।। ঘটিকা]

অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্র প্রেমের নামে আজ সিদ্ধি দান করিয়া কৃষ্ণ রাজ্যে বিশেষ যোগদান করিলেন। তাহাতেই কালী রাজ্য সর্ব্ব রাজ্যেশ্বর হরিনামে দয়াময়ের চরণ লাভ করিল এবং শান্তি প্রস্রবণ খুলিয়া দিল। একটী অপূর্ব্ব লীলা আজ উপস্থিত হইল। শ্যাম যজুঃ ঋগ্বেদ সাধন যোগে চতুর্ব্বেদী ভাব অথর্ব্ব বেদের মধ্যে আনিল। তাহাতেই ব্রহ্মনাম সিদ্ধ হইয়া দয়াময় নামে পূর্ণ যোগদান করিল। রামরাজ্য প্রেম রাজ্যের মধ্যে আসিল, শিব সিদ্ধি চিন্তামণির যোগ পূর্ণ করিল। তাহাতেই রোগের ভাব, শোকের ভাব চলিয়া গেল। মহিলাগণ বিশুদ্ধ রূপ লাবণ্য জগতে বিস্তার করিবার কার্য্য লাভ করিয়া ঘরে ঘরে জনে জনে দয়াময় নাম বিতরণ করিতে লাগিল তাহাতে রাজগণ রাজা দয়াময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। চৈতন্যময় হরি সম্মুখে দণ্ডায়মান।

সর্ব্ববিদ্যা পূজনীয় অবস্থা ধারণ করিয়া জগতের পূজা প্রেমেতে বিসর্জ্জন দিল। "অতএব প্রেমের নামে সর্ব্বস্ব দান জয় দয়াময় হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান কর। জগতে দর্শনের ভাব এই ধ্যানের পূর্ণতা– "জয় হরি পূর্ণ ধাম জয় দয়াময়" এই নমস্কার। পরে জয়ধ্বনি।

(৪)

২৪ শে চৈত্র ১৩০৪ বাং

উপাসনাতে নিম্নলিখিত মহা মহাকালীর বাণী

এখন অবধি এই গাছতলায় পূর্ণযোগ দেওয়া হইল। সর্ব্ব তীর্থের যোগ এ স্থানে আসিল। আপাততঃ এ স্থানকে প্রেমপুরী বলিয়া নির্দেশ করা হইল। দয়াময়ের আদেশানুসারে ধর্ম্মরাজ এই গাছতলার দ্বার রক্ষক অর্থাৎ প্রেমপুরীর দ্বারবান নিযুক্ত হইলেন। এখন অবধি যাহারা গাছতলায় আসিবে তাহারা লম্বা ভক্তি দিয়া– "সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়" এই নাম ৫০০ জপ করিবে। "শান্তি হরি জয় দয়াময়" এই নমস্কার করিবে। দয়াময়েতে যাহাদের বিশ্বাস আছে শুধু তাহারাই এই গাছতলায় আসিবার অধিকারী। এখন আমি প্রেমময়ী নাম গ্রহণ করিয়া এই গাছ তলায় অবস্থিতি করিলাম। প্রেম বলিতে মৃত্যু ও অমৃতের পূর্ণযোগ বুঝায়। এই গাছ তলা হইতে আহারীয় দ্রব্য স্থানান্তরে নেওয়া নিষেধ।

পরোপকার–

পরোপকার আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা আদর্শ জীবন লাভ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। যাহারা ঈশ্বরের নামে কার্য্য করেন তাহারা দেখেন আমার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ম্ম বা ভাব থাকিতে পারে না। তাহারা ঘরে ঘরে অণু পরমাণুতে দয়াময়ের কার্য্য দর্শন করেন। তাহার নিকটে আপন পর শত্রু মিত্র কেহ নাই।

সকল এক জানিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন। স্বার্থ থাকেনা বলিয়া তাহার কাছে জগত ভ্রাতা, ভগিনী, শ্বশুর শ্বাশুড়ী, দেবর, ভাসুর, জনক জননী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার শরীর মন কেবল জগতের শান্তি বিধান করিতে ব্যগ্র হয়। তাহার বিষয় সম্পদ জগত গ্রহণ করে। তিনি দেখিয়া আনন্দিত হন। আমার বলিয়া তাহার কিছুই থাকেনা। আমিত্বের খেলা ফুরাইয়া যায়। তিনি সর্ব্বদা উপলব্ধি করেন সকলের সঙ্গে প্রেম না জন্মিলে তাহার শান্তি নাই। মুক্তির পথে দণ্ডায়মান হইলেই মানব পরোপকারীর হৃদয় ধর্ম্ম মন্দিরে পরিণত হয়। দেব কি নর কাহারও সহিত তাহার পার্থক্য থাকেনা। সকল এক বলিয়া আনন্দের সীমা থাকে না। জগত মাতার কোলে স্থান লাভ করিয়া প্রশান্ত হন। ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। দয়াময় তাহার নিকট অবতীর্ণ হন। তিনি ঈশ্বর দর্শন করেন।

"মিলন"

সাধনের ফল কি? আনন্দ ব্রহ্ম।

সাধক আশা করেন সর্ব্বদা তাহার মন আনন্দে মগ্ন থাকে। প্রকৃতি পুরুষ আনন্দের মূর্ত্তি। আনন্দ ব্যতিরেকে মানুষ তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেনা। আংশিক আনন্দ কখনও তৃপ্তি দিতে পারে না। সকল প্রকার আনন্দ একত্র হইলেই মন উল্লাসে নাচিয়া উঠে। ঈশ্বর আনন্দময়, তাঁহার নাম আনন্দে পূর্ণ। এই আনন্দ জগতে পড়িয়াছে। সকলের জন্য উপাসনা করিলে আনন্দ আসিবে। যাহারা আনন্দ পাইয়াছেন তাহাদের পথ অনুসরণ কর। সংসারে পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি লইয়া এক আনন্দের মেলা। এই আনন্দে যাহার মন ডুবিয়াছে, ঈশ্বর জানিয়া প্রেম শিখিয়াছে, তিনিই দেখিবেন বিষয় অমৃতময়। তিনি প্রেম সাগরে নিমগ্ন, মায়ার উচ্ছ্বাসে তিনি মাতোয়ারা নহেন।

মায়া তরণী করিয়াই তিনি পর পাড়ে উঠিয়াছেন। মায়ার নাম ঈশ্বর দয়াময়। বিশেষভাব এই তিনি ছদ্ম বেশে কার্য্য করিতেছেন। প্রকৃতির আবরণ উন্মুক্ত হইলে, মায়াই মুক্তির সুফল প্রসব করে। মায়ার আরাধনা অবশ্যই করিতে হইবে। মায়ার কার্য্য খেলা বিলাসে আপন হারা নামের পুষ্প উপহার তাহার বীজ মালা। দয়াময় যাহাকে কার্য্য দিবেন তাহার জীবন পথ সুগম হয়। তাহার সকল আশা অচিরে পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহার সাধন ভজন একটি কেন্দ্রে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হয়। এই কেন্দ্র স্ত্রী পুরুষের যোগ। ইহাকে মধ্য বিন্দু বলা যায়। স্বামী-স্ত্রী একযোগে দয়াময় নাম সাধনে ব্রতী না হইলে প্রকৃতি পুরুষ ও মহাশক্তির ক্ষেত্র অধিকারে আসিতে পারেনা। উৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় স্ত্রী পুরুষের যোগে চলিতেছে। ইহাকে ঈশ্বর নির্দ্দেশ মনে করিবে। যুগল মিলন ঈশ্বরীয় যোগ প্রকাশ করে। সর্ব্বযোগ পূর্ণ হইলেই মিলন পূর্ণ হয়। তখন দয়াময় নামের কার্য্য আরম্ভ হয়। তখন শুভ্র জ্যোতি নিরাকার সাকার লইয়া কার্য্য বিতরণ করে। অবিনাশী সিদ্ধযোগ ফুটিয়া উঠে। স্ত্রী-পুরুষ এক হইয়া যায়। দয়াময় নামের আদর্শ মূর্ত্তি তখন দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর হইবে। আনন্দ ও জয়দুর্গা এই শক্তিদ্বয় সর্ব্বতোভাবে তখনই উপাসনার তত্ত্ব খুলিয়া দিবে।

(৫)

শ্রীশ্রীমদাচার্য্য আনন্দস্বামী মহাশয়ের নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে ২৫শে পৌষ হইতে উৎসব আরম্ভ

২৫শে পৌষ ১৩০৬বাং

প্রথম দিবসের কার্য্য

প্রাতে উপাসনাতে **১১** ঘটিকা পর্য্যন্ত সাব্যস্ত যোগ বিশেষভাবে আরম্ভ হইল। কার্য্যের নিয়ম সম্বন্ধে প্রকাশ হইল।

প্রথম উপাসনান্তে সকলে জনে "অরি দমন সিদ্ধি ক্রীং দয়াময়" এই নাম ১০০০ জপ করিবে ও নমস্কার "হরি কর্ম্ম সিদ্ধি জয় দয়াময়।" দ্বিতীয় নিয়ম– প্রেমের রাজ্য পূর্ণ হইবার জন্য ৪টার সময় প্রেম শান্তি লাভের উপদেশ ও ধ্যান ৩ বার করিবে।

তৃতীয় নিয়ম– সন্ধ্যার পর উপাসনা।

৪র্থ নিয়ম– দিবাতে সম্পূর্ণ আহার ও রাত্রিতে অল্পাহার।

৭ দিবস এই নিয়ম তাহার পর অন্য নিয়ম হইবে।

৪ টার পর উপদেশের সার

প্রাণায়ামাদি ন্যাসাদি হঠযোগের কার্য্য করিবার প্রয়োজন এখন শেষ হইয়া গিয়াছে। নাম জপ ধ্যানই মোক্ষ সাধন। সাধন সম্বন্ধে সিদ্ধির ব্যাপার সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন প্রকারেই মানুষের সাধন পূর্ণ হইতেছেনা। ইহার কারণ ব্যবসায়াদি শুদ্ধ যোগে আইসে নাই। ইহার অর্থ এই যে মানুষ জীবনোপায়ের জন্য যাহা করিয়া থাকে, তাহা ঈশ্বরেতে অর্পণ করিতে পারেনা। জীবন দয়াময়ের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র সঙ্কট নিবারণের কার্য্য। অতএব সর্ব্বতোভাবে প্রাণ মন শরীর তাহাতে সমর্পণ কর তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণ প্রেমের ঢেউ তোমাদের শরীর মনকে পবিত্র করিবে ও দেহ ব্রহ্মময় হইবে, এই সাধনের শেষ অবস্থা।

পৃথিবীতে যে সকল বিষয়ের মধ্যে মানুষের প্রেম আছে সেই সকল বিষয় দয়াময় এই কথা মনে রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই আত্ম সমর্পণের কার্য্য হইয়া যাইবে। দয়াময় এই উপদেশ সকল হৃদয়ে সাব্যস্ত যোগে নিহিত কর জয় দয়াময় ৷৷

"বিষয় রাজ্য কর্ম্ম ক্ষেত্র হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান কর।

২য় দিবসের কার্য্য
অপরাহ্ন ৪টার সময় উপদেশ

শিবাশিব সিদ্ধি হরি দয়াময়, এই নাম জনে ১০০ জপ কর। নমস্কার– পূর্ণ কার্য্য জয় দয়াময়।

শিব কৃষ্ণ কালী যোগে সাধনের পূর্ণ কার্য্য করিতেছে। শিব সাধনে জ্ঞান, কালী সাধনে কর্ম্ম ও কৃষ্ণ সাধনে প্রেম জগতে সিদ্ধি দান করিতেছে। কর্ম্ম প্রেম এই দুয়ের সাধন পূর্ণ হওয়ার পর শিব যোগ শান্তি দান করিয়া ব্রহ্মনামে রাজ্য কার্য্য পূর্ণ করিতেছে। ব্রহ্মনাম দয়াময় নামে মিশ্রিত হইয়া দয়াময় নাম জগতে প্রচার করার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। জ্ঞান, প্রেম কর্ম্ম এই তিনের একযোগে জগতের সাধন পূর্ণ হইতেছে। অদ্য উপাসনাতে জগত সাধন এক প্রকার শেষ হইয়া গেল। জগতের পরিত্রাণ নিকট হইয়াছে এই আভাস পাওয়া গেল। বিজন বন ও সজন নগর একযোগে দয়াময়ের রাজ্য বিস্তার করিয়া অভাব মোচনের কার্য্য আরম্ভ করিল। তোমার ভাব তোমার অভাব, সর্ব্বযোগে জগতে তোমারই কার্য্য হইতেছে, একমাত্র "তুমি দয়াময়" এই প্রার্থনা ৩ বার কর ও নমস্কার "আমার আমিত্ব দূর কর জয় দয়াময়।"

"বিকশিত কুসুম হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান কর– নমঃ "হর চেতনে মন দুঃখ জয় দয়াময়"।

৩য় দিবসের কার্য্য
অপরাহ্ন ৪টার সময়

"শিব যোগ সিদ্ধি হরি রাজ্য জয় দয়াময়" ১০০ জপ। নমস্কার– শান্তি পূর্ণকাম জয় দয়াময়।

উপাসনা-মনে মুখে এক করিয়া দয়াময়ের নিকট মুক্তি প্রার্থনা। শরীর মন অনুরাগ সঞ্চার হইবার জন্য পূর্ণ অনুরাগের সাধন দয়াময়

নাম হৃদয়ে গ্রহণ করাও উপাসনার এক অঙ্গ। নামেতে ও ঈশ্বরেতে ভেদ নাই, এই কথাতে বিশ্বাস হওয়া আবশ্যক। হৃদয় মন সর্ব্বতোভাবে বাসনা রহিত হওয়ার জন্যে সর্ব্বদা মুখ্যপদ দয়াময় নাম এই কথা মনে রাখিতে হইবে।

"শমন দমন কর হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান। নমষ্কার– শুদ্ধ যোগ জয় দয়াময়।

৪র্থ দিবসের কার্য্য

অপরাহ্ন ৪টার সময়–

"প্রেমরূপ সিদ্ধি কর্ম্ম ক্রীং জয় দয়াময়" ১০০ জপ। নমষ্কার– শান্তি কর্ম্মযোগ জয় দয়াময়। শান্তি দয়াময়ের এক স্বরূপ। শান্তি অশান্তি এক স্থানেই স্থিতি করিতেছে। এই উভয়ই দয়াময়ের মঙ্গল রাজ্যের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। ইহারা উভয়ই মঙ্গল সাধক। অতএব দয়াময়ের ইচ্ছানুসারে উভয়কেই সমভাবে গ্রহণ কর। শুভ্রবর্ণ ও কালবর্ণ উক্ত প্রকার দয়াময়ের স্বরূপ। যদি কালবর্ণকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হও তবেই শুভ্র কাল উভয় একযোগে সিদ্ধির সাধন পূর্ণ করিবে। তাহা ব্যতীত সিদ্ধি লাভের আশা হতাশা মাত্র। "শান্তি রাজ্য পূর্ণ কর জয় দয়াময়; সিদ্ধির রাজ্য অচিরে আন জয় দয়াময়; আমরা যে আশা তোমার বাণীতে পাইয়াছি তাহা পূর্ণ কর জয় দয়াময়"– এই প্রার্থনা ৩ বার করিবে ও নমষ্কারঃ সাধ্যাযোগিনী জয় দয়াময়।

নমষ্কার– প্রেমরাজ্য পূর্ণ কর জয় দয়াময়।

"হৃদয় সিদ্ধি কর্ম্ম নাম পূর্ণ হরি হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান কর।

নমষ্কার– ছিন্নমনা ভাব দূর কর জয় দয়াময়।

৫ম দিবসের কার্য্য

অপরাহ্ন ৪টার সময়–

"নির্ভরসা সিদ্ধি প্রেম কর্ম্ম ক্রীং হরি জয় দয়াময়"

"জনে ২০০ জপ ও নমষ্কার "পরম রাজ্য জয় দয়াময়।"

মানুষ দয়াময়ের চরণে নির্ভর করিতে না পারিয়া অলীক চিন্তাতে অভিভূত হইয়া থাকে। মনের মালিন্য শুভ্র জ্যোতিঃ দর্শনে দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু– জ্যোতিঃহীন দর্শন জ্ঞানযোগে হৃদয়ে প্রেমের সহিত গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া সর্ব্বময় দয়াময়, এই ভাব উদয় হয় না ও শুভ্র জ্যোতিঃ দর্শনেরও স্থায়িত্ব অল্পক্ষণ হইয়া থাকে। মনের স্থির ভাব স্থায়ী হওয়ার জন্যে অদ্য কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অতএব "অর্থ শূন্য মনস্তাপ হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান কর। নমষ্কার "কর্ম্মযোগিনী সিদ্ধি জয় দয়াময়।"

প্রার্থনা কর–

হে দয়াময় জীবন সাধন পূর্ণ করিবার জন্য আমরা সমীপস্থ যোগলাভ করিতে চাই ও তোমার নির্দ্দেশ জানিতে ব্যাকুল হইতেছি। ইহাতে আমাদের লাভের সময় হয় নাই বলিয়া যে তোমায় প্রতিকূল দেখি তাহাতে যেন বিরক্তি ও নিরাশ না হই এই প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর জয় দয়াময়।

নমষ্কার– হর কষ্টযোগ জয় দয়াময়।

৬ষ্ঠ দিবসের কার্য্য

অপরাহ্ন ৪টার সময়

"শিবরাজ্য ব্রহ্মধাম জয় রাজ্যপতি জয় দয়াময়" ১০০ জপ নমষ্কার– রক্তমাংস সিদ্ধি জয় দয়াময়।

কালরূপ স্বভাবতঃই মন্দ ভাবেতে মানুষ গ্রহণ করে। শুভ্র সাধন

কালরূপ ব্যতীত স্থিরভাবে থাকিতে পারে না। অতএব কালবর্ণের পূজা কর তাহা হইলে সকল সাধন পূর্ণ হইবার কার্য্য আরম্ভ হইবে। রাগ পর পীড়নের জন্য নহে। রাগ দ্বারা শারীরিক মানসিক রিপুকে পরাজয় কর। সর্ব্ব শক্তিমান দয়াময় সাধ্যযোগ প্রদানের কার্য্য অদ্য বিশেষ রূপে আরম্ভ করিলেন। মনে রাখ, আর সকল সাধন কর্ম যোগে সিদ্ধির মধ্যে আছে। কর্মযোগ একান্ত মনে দয়াময়ের ইচ্ছার প্রতি নির্ভর করাকে ও হৃদয়মন তাঁহাতে সমর্পণকে বলা যায়। সারতত্ত্ব ইহার মধ্যেই আছে। এই সারতত্ত্ব আসিলেই জীবনে মুক্তি আরম্ভ হইল। 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়' এই কথাটি অলীক নহে। একান্ত মনে সরল হৃদয়ে দয়াময়ের সাধন পূর্ণ করিবার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাক। জগৎ প্রসন্ন হইয়া কোল দিবে।

"আদরিণী সাধন হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান কর।

নমস্কার– সাধ্য যোগ জয় দয়াময়।

'হরি হে, বিপদভঞ্জন দয়াময় সর্ব্বতোভাবে সাধন পূর্ণ করিয়া জগতের কর্ম্মযোগ সিদ্ধি কর জয় দয়াময়' এই প্রার্থনা।

নমস্কার– স্বয়ং সিদ্ধি কর্ম্ম দয়াময়।

॥ জয়ধ্বনি ॥

৭ম দিবসের কার্য্য

অপরাহ্ণ ৪টার সময়

"কঙ্কালসাধিনী হলাদিনী হৃদয়ে দয়াময়" ২০০ জপ নমস্কার– সিমন্তিনী জয় দয়াময়।

আজ, কাইল পরশু, এই তিন দিবসে সাধন পূর্ণ হইয়া সন্তান-সাধন সিদ্ধির যোগেতে আসিবে। অতএব মনে কর নিঃসন্তান ব্যক্তির জীবনে কোন সার নাই; কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানে যাহারা রত তাহাদেরই

জীবন সংশয় শূন্য ও নিরাময় রাজ্য অধিকারে আসিবে। ধর্ম্ম সাধনই জীবনের একমাত্র সার ধর্ম্ম। পরোপকার–জগতের হিতকার্য্য করাই ধর্ম্ম। কোন প্রকারেই মানুষ সাধ্য স্বরূপ লাভ করিতে পারে না, যদি জগৎ আমার সহিত একযোগে স্থিতি করিতেছে ও জগৎ ব্যতীত আমার আত্মীয় আর কিছুই নাই ও জগৎ আমার ও আমি জগতের এই কথাতে হৃদয় প্রসন্ন না হয়।

এক আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও আত্মা ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই, এই কথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম কর ও জগতের সেবাতে নিযুক্ত হও। তবেই প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ হইবে।

"জগন্ময় হরি হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান কর।

নমস্কার– কর্ণধার জয় দয়াময়।

তুমি আমার আমি তোমার সর্ব্বযোগে সাধন পূর্ণ কর জয় দয়াময় এই প্রার্থনা।

নমস্কার– রমণরাজ্য কর্ম্ম দয়াময়।

॥ জয়ধ্বনি ॥

৮ম দিবসের কার্য্য

প্রাতে সংকীর্ত্তন, প্রার্থনা ও ধ্যান।

অপরাহ্ণ ১টার সময় উপাসনা।

"জগদীশ হরি ক্রীং শক্তি হৃদয়ে দয়াময়" একদিন ১৭০০ জপ ও পরে ৬০০ জপ। নমস্কার–কর্ণধার জয় দয়াময়।

সন্ধ্যার পর উপাসনা– উপদেশ।

আহার সন্ধ্যার উপাসনার পর একবেলা-

উপদেশ যাহা কিছু জগতে আছে তাহা সকলই নির্দিষ্ট নিয়মভুক্ত

থাকাতে তাহার দ্বারা যে উপকারের প্রত্যাশা করা যায় তাহাও নির্দ্দিষ্টই আছে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এই উভয়েরই কার্য্য সমান। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই আছে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত এই ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যে যে অভাব দৃষ্ট হয় তাহা উভয় ব্রহ্মাণ্ডের যোগ ব্যতীত দূর হওয়ার অন্য পন্থা নাই। ঈশ্বর পূর্ণ, তাঁহার রাজ্যও পূর্ণ। ইহার মধ্যে অপূর্ণতার ভাব যাহা দেখা যাইতেছে তাহা উভয় মিলিত হওয়ার পূর্ব্ব কার্য্য।

যেমন জল জলে না মিলিয়া থাকিতে পারে না সেই প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ একই প্রকারের বস্তু, এক সময় মিলিত হইবেই হইবে। এই কথাতে বিশ্বাস কর ও দয়াময়ের কৃপার প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকে, জগতের প্রেম অবশ্যই লাভ হইবে এবং জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়া শান্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইবে। জগতের সেবা করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়া স্বার্থ ত্যাগ করাই পূর্ণ সাধন।

সিদ্ধযোগ পূর্ণ রাজ্য প্রকাশ কর জয় দয়াময়। "অবশ ইন্দ্রিয় চিত্ত সবশ কর জয় দয়াময়। প্রেমের নামে শান্তি আনয়ন কর জয় দয়াময়" এই প্রার্থনা ৩ বার কর।

নমস্কার– "শান্তি আনন্দ জয় দয়াময়।"

॥ জয়ধ্বনি ॥

৯ম দিবসের কার্য্য

জিজ্ঞাসু দিগের জন্য প্রশ্ন

১। কি লাভ করিলে মন নিশ্চিন্ত হইতে পারে?

২। মনে কি প্রার্থনা করে?

৩। মানসম্ভ্রম প্রতিপত্তি লাভের প্রার্থনা বিশুদ্ধ কি না?

৪। সাধনের উদ্দেশ্য কি?

৫। রোগ, শোক, মৃত্যু যাহা মানুষের মধ্যে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কি প্রয়োজনে জগতে আসিল?

৬। জগতের হিত ব্যতীত অর্থাৎ মঙ্গল ব্যতীত ঈশ্বর আর কিছু ইচ্ছা করেন কি না?

৭। কাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি?

৮। সাধারণতঃ সাধন কি নিয়মে চলিয়া আসিয়াছে ও কি নিয়মে বর্তমান সময়ে চলিতেছে ও কি নিয়মে শেষ হইবে?

৯। মানুষ কাহাকে অনুকরণ করিতে চায়?

৮ম প্রশ্ন মীমাংসা

পূর্ব্বে ভক্তির সাধন, শক্তি যোগে সাধন, নানা প্রকার সাধ্যযোগ উপস্থিত হওয়ার জন্য যজ্ঞাদি ও কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়া মানব সিদ্ধিযোগ লাভ করিবার কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিল।

মধ্যযোগে কর্ম্মের সাধন এক ঈশ্বরেতে সমকক্ষ যোগ গুরুর উপদেশানুযায়ী লাভ করিতে ব্যস্ত ছিল, তাহাতে স্বার্থপরতার ব্যাপার ছিল। উপায়হীন হইয়া লোক সকল কর্ম্মক্ষেত্রে অসিদ্ধিতে পরিবেষ্টিত দেখিয়া কিরূপে জীবন যাপন করিবে সাধন দ্বারা তাহার উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিতেছিল ও তাহাতে যাহারা বিশেষ ফল লাভে বঞ্চিত হইল তাহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া একান্ত মনে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হইল ও কৃষ্ণ সাধন, বিষ্ণু সাধন দূরে রাখিয়া বন দেবতার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

বর্তমান সময়ে সর্ব্বনাম সাধন আরম্ভ হইয়াছে। দয়াময় নাম হৃদয়ধামে উপস্থিত হইয়া জীবনমুক্তির আশা প্রবল হইয়াছে। ইহাই সাধনের শেষ যোগ। জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্মের একযোগে সিদ্ধিলাভ ও ঈশ্বরের রাজ্য লাভ ও আমিত্ব রহিত ভাব প্রবল হইতেছে ও পূর্ণতা

লাভের দিকে জীবনের গতি হইতেছে।

মনের কৈতব দূর হইয়া জগতে ভালবাসা ও নিশ্চিন্ত হওয়ার নিমিত্তে "অর্থশূন্য মনস্তাপ হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান প্রাতে ২ বার ও সন্ধ্যার সময় ৩ বার করিবে। নমস্কার "সিদ্ধি বিদ্যা চিন্তামনি জয় দয়াময়।" উক্ত বিষয়ের সিদ্ধির জন্যে, "স্বয়ং সিদ্ধি ব্রহ্মনাম হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান প্রাতে ১ বার ও মধ্যাহ্নে ২ বার ও সন্ধ্যা সময় একবার করিবে। নমঃ শরত শশী হৃদয়ে দয়াময়। ১৪ দিন পর মনের ভাব প্রত্যেকে প্রকাশ করিয়া বলিবে। সন্ধ্যার পর উপাসনার শেষ উপদেশ–

জগতের আদর্শ কি? এই চিন্তা করিতে গেলে ইহাই মনে হইয়া পড়ে যে যেমন সৌর জগৎ এক সূর্য্যের আকর্ষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে সেই প্রকার জগতও এক ঈশ্বরের ক্রোড়ে আছে ও তাঁহার দিকেই চলিয়া যাইতেছে। তাঁহার স্বরূপ চিন্তার মধ্যে আনিয়া, তাঁহার ন্যায় হইয়া, তাঁহার সহিত মিশিয়া থাকিবার ভাব দেখা যায়। আত্মাময় জগত পরমাত্মার সহিত যুক্ত না হইলে কিরূপে জীবন রাখিতে পারিবে? অতএব একমাত্র ঈশ্বরই জগতের আদর্শ। শান্তি দান কর, হৃদয়ে তোমার উপলব্ধি দান কর জয় দয়াময়। সিদ্ধ যোগ লাভ করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি এইরূপ শুদ্ধ ভাব আমাদের প্রতি অর্পণ কর জয় দয়াময়।

নমস্কার– কর্ম্মযোগ সিদ্ধি কর জয় দয়াময়।

॥ জয়ধ্বনি ॥

১০ম দিবসের কার্য্য

সংসার বন্ধন ছিন্ন হইবার জন্যে যে ব্যক্তি আগ্রহের সহিত উপায় অন্বেষণ করে তাহার দেখিতে হইবে সে কতদূর স্বার্থত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে। যদি দেখিতে পায় স্বার্থত্যাগ করিতে কিছু মাত্র পারে

নাই তবে এই প্রার্থনা রোজ ৩ বার করিতে হইবে। যথা– হরি হে অবারিত দ্বার, তোমার কার্য্য কর্ম্ম ও বস্তু সকল পরিপূর্ণভাবে সজ্জিত ও প্রয়োজনানুরোধে আদরণীয়। তাহার মধ্যে কোন একটি মনের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য না করিলে যে অশান্তির উদয় হয় তাহা তুমি দূর করিয়া কষ্ট নিবৃত্ত কর জয় দয়াময়। কোন বিষয়ের জন্য আমাকে ব্যতিব্যস্ত না হইতে হয় এবং কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ চক্ষুতে দেখিতে না হয় তাহার বিধান তুমি কর জয় দয়াময়। পূর্ণ কর মনের আশা জয় দয়াময়।

॥ জয়ধ্বনি ॥

একাদশ দিবসের কার্য্য
আহারের নিয়ম দিবাতে।

অপরাহ্ন ১টার সময় একবার ধ্যান। কথা, কখনও উপদেশ, প্রার্থনা। জিজ্ঞাস্য, সন্ধ্যার পর পূর্ব্ববৎ উপাসনা।

অদ্য ষড়চক্র যোগে কার্য্য আরম্ভ হইল। নাভীর নীচে স্বাধিষ্ঠান নামক স্থানে মন রাখিয়া প্রত্যেকের জপ ও ধ্যান করিতে হইবে। যখন ধ্যান বা জপ করিতে করিতে চক্রবৎ শুভ্র জ্যোতিঃ দেখা যাইবে তখন হইতে অন্য প্রকার কাজ আসিবে। স্বাধিষ্ঠান সুললিত চম্পক মুকুল ১৭টিতে সজ্জিত। বামে ৭টি ও দক্ষিণে ১০টি আছে পদ্ম মৃণাল মধ্য দিয়া উপরে উঠিয়াছে। পদ্মের দল ৩৬টি। একযোগে ৮টি প্রসিদ্ধ। তাহাদের মধ্যে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ও দর্শনে আসিবে। এই যোগ সিদ্ধ হইলে বাণী সফল হইবে।

"ক্রীং রাজ রাজ্যেশ্বর কিমিতি * সাধন হৃদয়ে দয়াময়" এই ধ্যান কর। "আর্য্য সাধন জয় দয়াময়" এই নমস্কার। ৩ দিবস এই কার্য্য।

---

* কিমিতি – রসায়ণ বিদ্যা

অপরাহ্ন ৪টার পর

জগতের কার্য্য জীবন মুক্তি লাভের বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? এখানকার কার্য্যের ভাব কিরূপ তাহা আলোচনা করিলেই জগতের অগ্রসরতার বিষয়ে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। অগ্রে ইহাই দেখিতে হইবে যে এখানকার উপাসকগণের মধ্যে দয়াময়ের প্রতি কাহার কতদূর বিশ্বাস হইয়াছে, রাগ দ্বেষ কতদূর ত্যাগ হইয়াছে এবং সাধনের জন্য মন কতদূর ব্যগ্র হইয়াছে।

উক্ত বিষয় সকল আলোচনাতে এই বাণী উপস্থিত হইল যে এখানকার লোকের মধ্যে কয়েক জনের চারি আনা যোগ উপস্থিত হইয়াছে। চলিত মাসের সাধন পূর্ণ হইলেই আর দুই আনা যোগ পূর্ণ হইবে। তারপর জগতের লোকের দয়াময় নাম দুই আনা উপস্থিত হইবে।

তখন বহু লোক কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে ও কতক লোক সাধন পাওয়ার জন্যে দয়াময় নাম লওয়ার ও সর্ব্বসাধনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে। ২ মাস মধ্যে অনেক নূতন লোক নাম লইতে অগ্রসর হইবে। অদ্য সন্ধ্যারতির পূর্ব্বে সকলেরই এই প্রার্থনা করিতে হইবে।

" হে দয়াময় তোমার রাজ্য তুমি গ্রহণ করিয়াছ জানিয়া তোমাতে বিশেষ অনুরক্ত হইব মনে করিয়াছি। অতএব প্রার্থনা যে তুমি আমাদের হৃদয় মনের সারথি হইয়া সিদ্ধি দান কর জয় দয়াময়"।

অষ্টম অধ্যায়

সাধন প্রণালী

শ্রী শ্রীমৎ স্বামিজীর মধ্যে সকল ধর্ম্মেরই সামঞ্জস্য ছিল। তিনি দেখিতেন স্বামী ও স্ত্রী মিলিত ভাবে কার্য্য করিলেই চক্ষুর সমীপে স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইতে পারে। এজন্যে তিনি তৎপ্রণীত প্রকৃত তত্ত্বে উল্লেখ করিয়াছেন–

"যাহাতে স্ত্রীর সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইয়া জীবন উন্নত করা যায় তাহাই প্রত্যেক সাধন ভজনের পূর্ণ আদর্শ ও একতার কারণ। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার সাধন দ্বারাই জীবনের আশা সফল করিতে পারিবে না, পথিকের ন্যায় সঙ্গীর আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। সঙ্গ যোগই মধ্য বিন্দু, ইহার মধ্যে প্রবৃত্ত থাকিলে অচিরে জগত করতলে আসিবে সন্দেহ মাত্র নাই। যিনি সঙ্গিনী বা সঙ্গীকে বশীভূত করিয়া সাধনের মধ্যে আনিতে না পারেন তাহার কর্ত্তব্য যে তিনি তাহার নিকট বসিয়া নাম জপাদি করেন ও তাহার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা বিশেষ প্রার্থনা করেন। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার মন ফিরিয়া সাধনের দিকে আসিতে থাকিবে"। (সূত্র/২৩)

বাস্তবিক, শাস্ত্র বা সিদ্ধ পুরুষেরাই মানবের হিতার্থে সাধন পথ প্রচার করিয়াছেন। মানুষের জন্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই বোধগম্য হইবে, কদাপি কেহ একাকী সাধন করিয়া পূর্ণ জীবন লাভ করিতে পারিবেনা, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সংযোগেই জগত সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহার স্থিতি ও বৃদ্ধি হইতেছে। যিনি সাধন প্রয়াসী তাহাকে জানিতে হইবে; যে মানব প্রকৃতি ও জীব প্রকৃতিতে এই সত্য নিরন্তর কার্য্য করিতেছে, দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বামী ও স্ত্রী ভাবে সর্ব্বদা জীবনের স্রোত চলিয়া যাইতেছে। আর যিনি জগতের ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া সর্ব্ব নিয়ন্তার দর্শন করিয়াছেন, তিনি উপলব্ধিতে জানিবেন, মানব সমাজের উন্নতি সুখ

বৃদ্ধি এই স্ত্রী পুরুষের যোগ ভিন্ন সাধিত হইতে পারে না। যতই ঘরে ঘরে প্রেম-সম্পদ বিস্তার লাভ করিবে ততই দিনের পর দিন সংসার সুখের নিদান হইবে। যে দিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে, যাহা কিছু সুখ এবং শান্তি পৃথিবীতে আছে ইহার মূলে স্বামী স্ত্রীর বিশুদ্ধ ভাব বিরাজ করিতেছে।

মানুষের দেহে অসংখ্য নাড়ী আছে। তন্মধ্যে শক্তি চক্রে চক্রে কার্য্য করেন, ইহা সাধকেরা দেখিতে পান। এই নাড়ী সমূহের মধ্যে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটি নাড়ী প্রধানা। গুহ্যমূল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সুষুম্নার প্রকাশ দৃষ্টি গোচর হয়। এই ত্রিবিধ শক্তিপথ সাধনের একমাত্র অবলম্বন। ইহা কেহ সন্দেহ করিতে পারেনা। যোগশাস্ত্রে এই নাড়ীচক্রকে ষটচক্র বলেন। আমাদের বাহিরের ভাবেও ডাক্তারেরা ইহার গঠন প্রণালীতে বিশেষত্ব দেখিবেন। এই ঈড়া নাড়ী স্ত্রীশক্তির বোধক, পিঙ্গলা পুংশক্তির বোধক বলিতে পারা যায়। উভয়ের মিলিত ভাব যেখানে, সেখান হইতেই সাধক সুষুম্নার উন্মেষ দেখিবেন। এই তিন নাড়ীকে কেহ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী বলিয়াছেন, কেহ বা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইজন্য মনে হয় বাস্তবিক মানব দেহ স্ত্রী পুরুষ তত্ত্বেই গঠিত- ইহাদের মিলনেই শান্তি এবং শক্তির অভিব্যক্তি হইতে পারে। সুতরাং জগতে যাহারা সন্ন্যাসী; স্ত্রী ছাড়িয়া যাহারা সাধন করিয়াছেন– তাঁহাদের কি সাধন পূর্ণ হয় নাই? এমন প্রশ্ন সকলের মনেই আসিতে পারে। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রেই পতি-পত্নী মিলিয়া ধর্ম্ম কার্য্য করিবার উপদেশ পাওয়া যায়। এখন উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে হইবে যে, যাঁহারা জগতে এইভাবে উন্নত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও সাধন পূর্ণ হইতে পারে নাই– যে পরিমাণ উন্নতি তাঁহারা করিয়াছেন, উহাতেও অলক্ষ্যে এই দুই তত্ত্বই কার্য্য করিয়াছে। যদি ইঁহাদের জীবনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুরূপা প্রকৃতি (স্ত্রী)

কার্য্য করিতেন–যদি তাঁহারা মানবের কল্যাণ মানসে সস্ত্রীক সাধন করিতেন, তবে তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব সর্ব্বাত্মকভাবে প্রকাশ পাইত। সম্যক সাধন সিদ্ধির মানসে সকলকেই স্ত্রী ও পুরুষ তত্ত্ব মানিতে হইবে। ঈড়ার পর্য্যবেক্ষণে অনুরূপ স্ত্রী এবং পিঙ্গলার পর্য্যবেক্ষণে অনুরূপ স্বামীর সন্ধান মিলিবেই মিলিবে। নচেৎ জগতের যোগে সাধন প্রতিষ্ঠিত হইবেনা। সর্ব্ব শরীরে যেমন ঈড়াকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রী প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে তেমন পিঙ্গলা ধরিয়াও পুরুষ প্রকৃতি নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। ইহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারেনা। সমীপস্থ ভাবে ঈশ্বর হইতে তত্ত্ব বুঝিলেও ইহার নিসংশয় বলিতে পারিবে। সাক্ষাৎ ভাবে সুষুম্নার গতি সন্দর্শন করিলে উভয়ের মিলনে যে ত্রিজগত চলিতেছে উপলব্ধি হইবে। এই সুষুম্নার অভ্যন্তরে সর্ব্বভাবেই মা মহাশক্তির কার্য্য ষোল কলায় পূর্ণ রহিয়াছে। অতএব যদি সাধন করিতে চাও স্ত্রী সহযোগে কর্ম্ম কর মানস অচিরে সফল হইবে। এক মূল হইতে শক্তির উদ্ভব হইয়াছে উহা হইতেই আবার স্ত্রী পুরুষ উপলক্ষে সৃষ্টি বিস্তার ঘটিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বসাধন সর্ব্ব তত্ত্ব করতলে আনিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের যোগ আবশ্যক– ইহাই সাধন পথ- ইহাই উন্নতির হেতু। এজন্যে সর্ব্বসাধক সর্ব্বদা স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন।

এ সম্বন্ধে স্বামীজীর উপদেশ আছে–

"আজীবন ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া থাকিবার জন্য যে সকল উপায় আমাদিগের আছে তন্মধ্যে স্ত্রী পুরুষের যোগই মুখ্য। এই দুইয়ের মধ্যেই জগত তিষ্ঠিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক পাপ ও পুণ্যের বোধ সিদ্ধাসিদ্ধ ব্যাপার, মনের যোগ নিবৃত্ত হইয়া যখন সিদ্ধকার্য্য উপস্থিত হইবে তখন অর্থলাভ, বিত্তলাভ ও কর্ম্মলাভ সকলই স্ত্রী পুরুষের যোগ বলিয়া প্রতীতি হইবে। বিষয় অবিষয় এক হইয়া ঈশ্বরের অমোঘ ইচ্ছা

সুসম্পন্ন করিবে। বিষয় ও অবিষয়ের মধ্যে অবিষয় প্রধান, অবিষয়ের যোগ শেষ হইলে বিষয় অবিষয় এক হইয়া সংসার স্বর্গ উভয় অনুকূল হইয়া যায়। সস্ত্রীক দয়াময় নাম সাধনই অবিষয়। এই অবিষয় যোগে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব প্রতিকার ইহারই মধ্যে নিবেশিত কর, দেখিবে, অচিরে জীবন মুক্তির পূর্ব্বভাষ প্রাপ্ত হইবে"। –যোগপ্রণালী

সর্ব্বদাই দেখা গিয়াছে স্বামিজী মহারাজ এ ধর্ম্মের সাধনে কোন দিন তাঁহার জীবন সঙ্গিনীকে ছাড়িয়া কার্য্য করেন নাই। এজন্যেই তিনি স্বয়ং যাহা দেখিয়াছেন পাইয়াছেন, উহাই জন সমাজে রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সাধন প্রণালী মূলে এই স্ত্রী পুরুষের যোগ ভিন্ন অন্য কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব অধিকারী ব্যক্তির জীবনে ইহাতে এই সর্ব্বধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব আবির্ভূত হইবে– সংসার এবং স্বর্গ একত্র মিলিত হইবে এবং জগতে ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইবে।

স্বামিজীর নিকট যাহারা অবস্থিতি করিতেন তাহারাও তাঁহার মুখে এই একটি উপদেশই অহরহ শুনিতেন। তিনি উহাই একমাত্র জীবনপথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসু মাত্রেই কেবল ইহার প্রশংসা শুনিতেন। তিনি এই স্ত্রী পুরুষের যোগের নাম 'মধ্য বিন্দু' বলিতেন। "করিলে যে মধ্য বিন্দু, পার হতে ভবসিন্ধু" এইরূপ উচ্চ প্রশংসার কথা তাঁহার সঙ্গীতেই রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইবে, বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে এ নিয়ম প্রতিপাল্য হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তির বিবাহ হয় নাই, তাহার পক্ষে কি উপায় হইবে? ইহার উত্তরে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে পর্য্যন্ত বিবাহ জীবন উপস্থিত না হইবে সে পর্য্যন্ত সাধন পথে সাধ্য সাধন অপূর্ণ রহিবে। সারতত্ত্ব লাভের পক্ষে বিবাহ করা সকলেরই প্রয়োজন পড়িবে। কিন্তু যিনিই এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, অবিবাহিত হউক ক্ষতি নাই, তিনিই ধীরে ধীরে সাধন করিবেন ও এই উন্নত জীবনাভিমুখে অগ্রসর হইবেন–পূর্ণ যোগ

প্রকৃত বিবাহের পথ খুলিয়া দিবে। বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ বিনা এই বিবাহের সফলতা আসিবেনা।

এজন্যে আরও প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে সকল বিবাহ প্রণালী জগতে রহিয়াছে, উহাতেই কি মানবাত্মার পরিতর্পণ ঘটিবে? স্বামিজীর মতে এ সকল বিবাহ প্রথা আমাদিগকে সার তত্ত্বের অধিকারী করিতে পারেনা। সুতরাং সিদ্ধ মনোরথ হওয়ার জন্য সকলে সাধন করিবে এবং সর্ব্ব ধর্ম্মের ঐক্যে যোগ দিয়া শেষে প্রকৃত সঙ্গী বা সঙ্গিনীর পরিচয় লাভে কৃতার্থ হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল–

প্রকৃত বিবাহ

"বিবাহ কার্য্য জীবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। জগতে যে যে রূপ বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে তাহা বাহ্যিক বন্ধনের ব্যাপার। যে সমাজে উভয় সম্মতিক্রমে কার্য্য হয় তাহাতেও বাহ্য বিষয়কে অনেক পরিমাণে লক্ষ্য করে। আন্তরিক ঐক্য বন্ধন যে কি এক স্বর্গের সম্পত্তি, তাহা মনুষ্য বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, অদ্যাপি জানিতেও সক্ষম হয় নাই। যে আন্তরিক ঐক্য দ্বারা দুই শরীর এক হয় ও সংসার এবং স্বর্গ একস্থানে মিলিত হয়, তাহারই নাম বিবাহ। বিবাহ কার্য্য সিদ্ধযোগেতে আছে। মনের শান্তি, সাংসারিক ও ঐশ্বরিক যোগ, সকলই প্রকৃত বিবাহের শুভ ফল। বিবাহ কার্য্যে ব্যত্যয় ঘটাতেই পৃথিবী রোগ শোক ও মৃত্যুর বিষময় ফল প্রসব করিতেছে। পৃথিবীতে শুভ যাহা কিছু আছে তাহার মূল আধ্যাত্মিক প্রেম যোগ; ইহা ঈশ্বর ইচ্ছাতে স্ত্রী ও পুরুষদিগের হৃদয়ে কিছু জানিত ও কিছু অজানিতভাবে বিচরণ করিতেছে। আধ্যাত্মিকভাবে মিলনের যোগ পূর্ব্বে উপস্থিত না হইলে, কোন ব্যক্তির সহিত কোন ব্যক্তির প্রেম হইতে পারেনা। যত বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি অমঙ্গলের ব্যাপার দেখা যায়, তাহাও আধ্যাত্মিক বিষম যোগের ফল। কিন্তু শারীরিক বিবাহযোগ বিশেষভাবে

থাকিলে, অন্ততঃ এ সমুদয় অমঙ্গলের সংশোধন হইতে পারিত; তাহাও না থাকা অমঙ্গলের কারণ সন্দেহ নাই। বিবাহ যোগ ধর্ম্মের ন্যায় সকল প্রকারের বিষম যোগ হইতে রক্ষা করিয়া গরলকে অমৃতে পরিণত করে, জগতের সহিত মানুষকে আত্মীয়ভাবে মিলিত করে। শান্তভাবে যাহারা ঈশ্বর সাধনে রত, আধ্যাত্মিকভাবে তাহাদের বিবাহ যোগ আরম্ভ হয়। বিবাহ যোগ শরীরেতে কার্য্য না করিলে তাহারা সাধনের শেষ ফল লাভ করিতে পারিবেনা। মানুষ সংসার পরিত্যাগ ও ভাই বন্ধু সকল হইতে দূরে গমন করিয়া, নানা প্রকার সাধন অবলম্বন পূর্ব্বক, কেহ বা শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা জীবিত থাকিয়াও আপন অভীষ্ট লাভে অদ্যাপি হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। তাহারা বিবাহ যোগ লাভ না করিয়া জীবনাশা সফল করিতে পারিবেনা। চৈতন্য, বিবাহযোগ সাধনের কন্টক ও তাহা এ সময়ে প্রকৃতরূপে হইতে পারে না জানিয়া স্বয়ং ডোর কৌপিন ধারণপূর্ব্বক শিষ্যগণকে এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে পথ প্রদর্শন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা জীবনমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া লোকেতে প্রকাশ আছে, তাঁহাদের জীবন কোথায় যে তাহা দেখিয়া জীবনমুক্তির লক্ষণ উপলব্ধি হইবে। বাস্তবিক কেহ অদ্যাপি জীবনমুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এমন সময় শীঘ্র আসিবে, যখন ঈশ্বর মানবগণ সফল মনোরথ হওয়ার জন্য প্রকৃত বিবাহযোগ পৃথিবীতে আনিয়া দিবেন ও পরমানন্দ লাভে কৃতার্থ করিবেন।”

এই প্রশ্ন এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, অন্য ধর্ম্মে কি এই বিবাহ সম্বন্ধে সিদ্ধযোগ অধিকারে আসিতে পারেনা? এ পর্য্যন্ত অপর কোন ধর্ম্মেই এ তত্ত্বকে এত উর্দ্ধে কোন মহাপুরুষ স্থান দেন নাই, দিলেও ইহার কোন কথা লোকে প্রচারিত হয় নাই।

সুতরাং এই সর্ব্বধর্ম্মের অস্থি মজ্জায় কেবল এই বিশেষ তত্ত্বেরই উপদেশ রহিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করিতে পারি, সত্য স্বরূপে এই সর্ব্বধর্ম্মের সাধনেই মানুষের জীবনে বিবাহ লীলার অভিনয় হইবে। স্বামিজীর হিসাবে এ পর্য্যন্ত জগত জানিতেই পারে নাই যে, বিবাহ কার্য্যে ব্যত্যয় ঘটাতে জগত রোগ শোক মৃত্যুর বিষময় ফল প্রসব করিতেছে। যাহা কিছু শান্তি, সুখ ও সম্পদ, তাহা কেবল বিবাহ যোগেই সমাজে আসিতেছে। এ ছাড়া সর্ব্বসাধন ভিন্ন যখন মানুষ পূর্ণতা পাইতে পারেনা, তখন সাধক জীবনে এ ধর্ম্ম বিনা কোনদিন সেই বিবাহ বিধান প্রতিষ্ঠিত হইবে না। অতএব স্বীকার করিতে পারি বিবাহযোগ সর্ব্বধর্ম্মের পরিণতি হইবে।

সমাজের বিবাহ প্রণালীতে সাধন ভজনের কোন উদ্দেশ্য নাই। ইহাতে এত অকুশল নিশিদিন রাজ্য বিস্তার করিতেছে। ছাত্র-শিক্ষক, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন অথবা যুবা-বৃদ্ধ সকলেই স্বীকার করিবেন, যে প্রণালীতে আমাদের বিবাহ হইতেছে, উহাতে কেবল ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম, সুবিধা-অসুবিধা বা সুখ ভোগেরই হিসাব নিকাশ চলিতেছে। ইহাতে কি পরমার্থের সন্ধান মিলিবে? যদি নির্ব্বাচনকালে বর কন্যা পক্ষের মনে ঈশ্বরের সেবা ও সাধনার বিষয় সর্ব্বপেক্ষা অধিক কার্য্য না করে, তবে কিসে সেই বিবাহের ফলে আমরা চির সত্যের মালিক হইতে পারি। বাস্তবিক উদ্দেশ্য নিয়া কার্য্য করিতে হয়, তবে বস্তুর সম্মিলন হইবে। সুতরাং ঈশ্বরোদ্দেশ্য রাখিয়া বিবাহ করিতে হইবে তবেই অকল্যাণ বিনাশ পাইবে। বিবাহ নির্ব্বাচন সময়ে সাধন প্রাপ্তির কামনা লক্ষ্য করিলেই বা পথ সুগম কিসে হয়? কেননা, মা বাপ অথবা যাহারা বিবাহের প্রস্তাবাদি সকল কার্য্য করেন, তাহাদের কি ক্ষমতা আছে যে, তাহাদের নির্ব্বাচিত পতি-পত্নীর জীবনে বিমলানন্দের ঢেউ খেলিবে ও তাহাদের মিলনে সাধনের সর্ব্বাধিকার ও

চির পবিত্রতা জন্মিবে? সুতরাং সম ধর্ম্মাক্রান্ত স্ত্রী পুরুষ যাহাতে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয়, তাহার উপায় সংসারী অন্ধ দৃষ্টি কি করিবে? এইজন্যই বিবাহের কুফল ফলিয়াছে। অতএব বলিতে হয় আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে যে পর্য্যন্ত প্রকৃত চক্ষুষ্মান মহাপুরুষগণ আসিয়া সমাজের কার্য্যভার গ্রহণ না করেন। নচেৎ চল, আমরাই সাধন করিতে থাকি, সত্যের সন্ধানে মিলিত ভাবে কার্য্য করি, যেন দেশে দেশে সর্বত্র ঈশ্বরোদ্দেশ্যে মানব জীবন প্রবাহিত হয়-ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে বিবাহ বিধি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং আসুরিক ভাব পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সেই আরাধ্য ঈশ্বরকে জীবনের একমাত্র সম্বল করিয়া অগ্রসর হইতে পারি।

এই বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ প্রণালীতে যে কুফল ফলিয়াছে উহার প্রতিকার একমাত্র ঈশ্বর সাধনেই সম্ভবে। কিন্তু একটি নূতন প্রশ্ন উঠিতেছে, উহা এই যে, এই পৃথিবীতে কোটি কোটি নর নারীরই বিবাহ হইয়াছে এবং হইতেছে। তাহাদের নির্ব্বাচন ঈশ্বর দ্রষ্টা মহাপুরুষগণ করেন না, সুতরাং তাহাদের অনেকেই প্রকৃত সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন নাই, এখন ইহার প্রতিকার কি হইবে? সমাজের ভাবে, দেশের ভাবে এই উত্তর বলিতে পারি যে এমন দিন আসিতেছে, যে দিন প্রকৃত বিবাহ যোগ সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইবে। অন্তর্দর্শী মহাপুরুষগণ এজন্য কার্য্য করিবেন ও কালে বিশুদ্ধ বিবাহ প্রণালী স্থাপন দ্বারা ধর্ম্মভাবে জগত গঠন করিবেন। অধিকারীদের মধ্যেই প্রথমে সূক্ষ্মভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ বিবাহ ক্রমে প্রকাশিত হইবে- যে যাহার স্ত্রী বা স্বামী সে তাহাকে প্রাপ্ত হইবে।

স্বামিজী মহারাজ এ সম্বন্ধে যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা তাঁহার "সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী" নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

২৩শে ভাদ্র রবিবার ১২৯১ বাং

মানসিক কার্য্য মানুষের মনে যাহা উপস্থিত হয় তাহা কোন প্রকারেই মানুষ পূর্ণ করিতে পারে না, এই কথা মনে হইয়া বড় কষ্ট হয়। কিন্তু আজ সেই দিন আসিল যে দিনে দয়াময়ের দুর্ণিবার অস্ত্র জগতের অমঙ্গল দূর করিবার বিশেষ কার্য্য করিবে। আজ আমরা রাম হরি, কৃষ্ণ হরি, সাধন হরি সমস্ত হরিনাম একযোগে দয়াময় নামের সহিত লাভ করিলাম। আমাদের আর কোন অশান্তি অমঙ্গল রহিল না। এই কথা দয়াময় নিজ মুখে সাক্ষ্য দিতেছেন। পরমৈশ্বর্য্য, পরম কারণ, পরম রাজ্য লাভ, পরম সামীপ্য সকলই এই নামের মধ্যে রাজ্য লাভ করিয়াছে। মাতৃস্তন্য পান, উদর কৃমি রোগে মানুষ যে কষ্ট পাইতেছে তাহার বিশেষ ঔষধ। এই স্তন্য যাহার হৃদয়ে কার্য্য করিতেছে তাহারই চরিত্রগত দোষ সংশোধিত হইয়া মহাসুখের ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে এই কথা দয়াময় বলিতেছেন। ইহার মধ্যে জগতে এক ভারি ক্রন্দনের শব্দ উঠিল। এই ক্রন্দন কিসের? এই ক্রন্দন মানুষ মানুষের সঙ্গে যে চির সম্বন্ধ যোগ ছিল তাহা ছিন্ন হইয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। কি প্রকার ছিন্ন ভাব? বিবাহ যোগে মানুষ মানুষের সঙ্গে যে চির সম্বন্ধ করিয়াছিল তাহা ভগ্নপ্রায় হইল। একজন আর একজনকে বলিতেছে তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে। দয়াময়ের সাক্ষাতে এই কথা উপস্থিত হইল। দয়াময় বলিলেন তোমাদের বিবাহ চিরকালের জন্য ছিলনা। রোগ, শোক ও মৃত্যু সংসারে রাজত্ব করিবার জন্য এইরূপ বিবাহ হইয়াছিল। যদি চিরমিলন যোগের লোক একত্র হইত তবে সংসারে রোগাদি থাকিতে পারিত না; এখন সময় হইয়াছে তোমরা পৃথক হইবে, খেদের প্রয়োজন নাই। যে যাহার সম্পত্তি সে তাহার ঘরে যাইবে। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা– শেষ যোগ অর্থাৎ অন্ধকার রূপ জগতের মন্দ যোগ শেষ করিয়া প্রকাশ যোগ আনিতে হইবে।

এই নিমিত্ত অগ্রে এই বিশৃঙ্খল ভাব হইয়াছিল। তোমরা আপন আপন প্রেমের লোক লাভ করিতে পারিবে। দয়াময়ের নাম লইয়া শরণাপন্ন হও। দয়াময়ের এই বাণী শুনিয়া জগতের লোক বলিতে লাগিল যদি আমরা রোগ শোক মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ লাভ করি তবে আমাদের প্রতি যাহা আজ্ঞা কর তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া লইব। “মহাশক্তি সম্মুখে দয়াময় হৃদয়ে” এই ধ্যান কর। “মেঘনা নদী সম্মুখে দয়াময় হৃদয়ে” এই ধ্যান কর।

সঙ্গীত বিভাস-দেবগিরি-একতালা

দয়াময় নাম পরম কারণ কলুষনাশন হৃদয় শাসন,
জীবনের ব্রত, দয়াল নামে হত কেবলই সম্পদ, বিপদ নিবারণ।
রমণীয় রাজ্য নামেতে কেবল, দেখিল নয়ন ভুলিল সকল,
বিষয় লালসা চরণ যুগল ক্রীতদাস চায় সদা সর্ব্বক্ষণ।
মিতব্যয়ী যারা ছিল এ সংসারে সে করিল আনন্দ আপন পশারে।
কিন্তু গুণগ্রাম সব চলে গেল দূরে স্থায়ী ফল কেবল নামেতে এখন।
একবার ভজ নাম রস, সুধা, ঘুচিবে তোমার মনের দ্বিধা,
দয়াময় নামে সাধনের বাধা, শান্তির সলিলে হইবে মগন।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ

প্রার্থনা

॥ জয়ধ্বনি ॥

নবম অধ্যায়

সর্ব্ব ধর্ম্মের মূলকথা

শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত সংক্ষেপে ‘প্রকৃত তত্ত্ব’ নামক গ্রন্থেই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে শ্রীমৎ মনোমোহন দত্ত আমাদের নিকটে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্য অনেক নামের লোক নিয়াও সমালোচনা করিয়া মূল সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছি এবং পরে প্রধান প্রধান ভক্ত ও প্রচারকদের সঙ্গে সাধন ভজনের রীতিনীতির খোঁজ খবর লইয়াছি। শেষে, ‘সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী’ ও ‘যোগ প্রণালী’ নামক দুইটি পুস্তক এবং আচার্য্য মহারাজের সঙ্গীত সমস্ত পাঠ করিয়া উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি। এ সমস্ত উপায়ে যে সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছি এবং নিজে সাধন পথে যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি তৎসমস্ত ব্যাপারের ভিতর দিয়াই যে সকল সত্য প্রমাণযোগ্য মনে হইয়াছে তাহাই এখন বলিতে প্রয়াস পাইব। হইতে পারে, অনেক কথা সকলেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, আবার অনেক কথা অনেকের সমীপে সংশয় উপস্থিত করিতে পারে। মূল কথা, আমার বিবেচনায় ‘প্রকৃত তত্ত্বে’ প্রতিপাদ্য পঞ্চ পঞ্চাশতটী তত্ত্বই জীবন গঠনে এবং মুক্তির সাধনে সর্ব্বতোভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। কারণ উন্নতির অবস্থা লাভ করিলে এবং সামীপ্য, সাকল্য, কৈবল্য এবং শেষ যোগ অধিকারে আসিলে প্রত্যেকটি তত্ত্বই সর্ব্বযোগে সাব্যস্থ হইয়া সকল সন্দেহ দূরীভূত করে।

আমরা বলিতে পারি ‘দয়াময়’ নামই সর্ব্বধর্ম্মের মূলমন্ত্র। ইহাই ধর্ম্মার্থীর পক্ষে দীক্ষা মন্ত্র। এ নাম গ্রহণ করিয়া সাধন করিতে হইলে কোন একজন আচার্য্য বরণ করা প্রয়োজন, নচেৎ কোন্ নাম জপ করিতে হইবে কিংবা কোন্ কার্য্য করা আবশ্যক হইবে ইহা কে নির্দ্দেশ

করিবে? গুরুর উপদেশ মানিয়া কার্য্য করিতে করিতেই শেষে ধ্যানের অধিকারী হইবে।

সাধনের প্রথম অবস্থার নাম প্রবৃত্ত। কারণ, ইহাতে ধর্ম্মার্থীর হৃদয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তির ব্যাকুলতা জন্মে। ইহার পর যে অবস্থা তাহার নাম সাধক বলা যায়, কারণ, এই অবস্থার ভিতর দিয়াই উন্নতির অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। এই উন্নতির অবস্থা লাভ করিলে পর যখন সাধকের অর্দ্ধ পথ অতিক্রম হয় ও কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ ভাব আসিয়া হৃদয় মনের শান্তি বিধান করে তখন যে অবস্থা আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহার নাম সিদ্ধাসিদ্ধ। যখন সকল অভাব চলিয়া যায় এবং ঈশ্বরের সহিত সম্যক একতা লাভ হয়, তখন যে অবস্থা, তাহাই সিদ্ধ অবস্থা। অতএব সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়াই জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। দয়াময় নাম সাধন করিলে দেব ও নর প্রত্যেকেই এই পূর্ণ সিদ্ধ যোগ লাভ করিতে পারে।

কিন্তু একটি কথা আছে। যখন প্রবৃত্ত অবস্থা উপস্থিত হয় এবং ইহার ভিতর দিয়া সাধন অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই সামীপ্য যোগের কার্য্য সময়মত প্রকাশিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সাকল্য প্রভৃতি যোগও সামান্য পরিমাণে আসিয়া থাকে। যখন বিশেষ উন্নতির অবস্থা উপস্থিত হয়, জানিয়া শুনিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখনই সাকল্য যোগ সাধনে প্রকাশিত হয়। সাকল্যের অধিকার জন্মিলে– হৃদয় বন্ধনশূন্য হইয়া ঈশ্বরের সহিত সংযোগ প্রতিষ্ঠা করিলেই ধীরে ধীরে কৈবল্য আরম্ভ হয়। সকলের পরে শেষ যোগ– তখন আমিত্বের অবসান ঘটে এবং চিরকালের জন্য নিরানন্দ চলিয়া যায়। সাধন করিতে করিতেই এ সমস্ত অবস্থার গূঢ় মর্ম্ম জানা যায়। প্রকৃত কথা এই, সামীপ্যাদি যোগের কার্য্যই প্রবৃত্ত, সাধক, সিদ্ধাসিদ্ধ ও সিদ্ধ এই চারিটি জীবনের অবস্থায় ক্রমে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়।

প্রচারক ও আচার্য্য তাঁহার নিকটে যে উপদেশ লইতে আসে, ঈশ্বর

বাণী দ্বারা তাহার জীবনের অবস্থা জানিয়া সাধন প্রণালী বলিয়া দিবেন এবং যাহাতে হৃদয় মনের শান্তি রক্ষিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকল প্রকার অবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করিবেন। ইহার কারণ এই যে, যাহার যেমন প্রকৃতি সাধন প্রণালীও তাহার নিমিত্ত তদ্রুপ হইবে। এই জন্যই এক প্রকারের উপদেশ সকলের পক্ষে কার্য্যকর হয় না। ধর্ম্ম-গুরু সকল ধর্ম্মের ঐক্যে যোগ দিয়া ও এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর হইতে সর্ব্বতত্ত্ব লাভ করিয়া যখন সাধনপথ প্রদর্শন করিতে পারেন তখনই তাহাকে 'প্রকৃত গুরু' বলা যাইতে পারে।

অতএব বলিতেছি "ঈশ্বর ও জীব" এই দুই তত্ত্বের সন্ধান করিতে হইবে। ঈশ্বরের সহিত আমাদের পৃথক অস্তিত্ববোধ আছে। ইহাতেই আমরা সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য ইত্যাদি সংস্কার লইয়া কার্য্য করি। ইহাই 'মনের যোগ'। এই 'মনের যোগ' শেষ করিতে পারিলেই ঈশ্বরের সহিত একতার কার্য্য লাভ করা যায়। এই 'মনের যোগ' শেষ করিবার জন্য নিম্ন বর্ণিত ২৫ প্রকারের সাধকতার কার্য্য জীবন পথে আবির্ভূত হয়।

১। শ্রবণ-সাধকতা : যাহার দ্বারা ঈশ্বর বাণী শ্রবণ–পূর্ব্বক স্বীয় ও পরকীয় জীবনের ভূত ও ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান অবস্থা জানা যায়।

২। দর্শন-সাধকতা : যাহা দ্বারা ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়া মনুষ্য চিরজীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

৩। বিদ্যা-সাধকতা : যাহা দ্বারা সকল বিষয়ে মীমাংসা করিতে সক্ষম হয়।

৪। ইচ্ছা-সাধকতা : যাহার দ্বারা ঈশ্বর ইচ্ছার সহিত মনুষ্য ইচ্ছার মিলন হইয়া যায়।

৫। হৃদয়-সাধকতা : যাহার দ্বারা মনুষ্যের হৃদয় ঈশ্বরের সহিত তুল্যভাবে জগতে কার্য্য করে।

অপর বিংশতি প্রকার, যথা–

১। সিদ্ধি-সাধকতা : যাহার দ্বারা মনুষ্য হৃদয় ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন থাকে।
২। জগত-সাধকতা : যাহার দ্বারা জগতে ভালবাসা বিস্তার হয়।
৩। প্রেম-সাধকতা : যাহার দ্বারা মানুষের প্রেম আকর্ষণ করে।
৪। কার্য্য-সাধকতা : যাহার দ্বারা জীবনের কার্য্য জানা যায়।
৫। লক্ষ্মী-সাধকতা : যাহার দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ লাভের উপযোগিতা লাভ হয়।
৬। সম্পদ-সাধকতা : যাহার দ্বারা সকল অভাব মোচন হয়।
৭। অরি-সাধকতা : যাহার দ্বারা ধর্ম্ম পথের বাধা বিঘ্ন দূর হইয়া যায়।
৮। রবি-সাধকতা : যাহার দ্বারা শারীরিক বল বীর্য্য লাভ হয়।
৯। চন্দ্র-সাধকতা : যাহার দ্বারা কার্য্য সাধনে আয়াস ও আলস্য দূর হয়।
১০। শরীর-সাধকতা : যাহার দ্বারা শরীর রোগ হইতে মুক্ত হয়।
১১। দৃষ্টি-সাধকতা : যাহার দ্বারা শরীরে দৃষ্টিমাত্র সদ্ভাবের উদয় হয়।
১২। রস-সাধকতা : যাহার দ্বারা প্রেমরস পানে একাগ্র চিত্ত হয়।
১৩। রূপ-সাধকতা : যাহার দ্বারা রূপ ও অরূপ উভয়ের একতা ইন্দ্রিয় গোচর হয়।
১৪। মৃত্যু-সাধকতা : যাহার দ্বারা মনুষ্য অমর হয়।
১৫। উর্দ্ধর-সাধকতা : যাহার দ্বারা শারীরিক উর্দ্ধরতা সাধিত হয়।
১৬। কাল-সাধকতা : যাহার দ্বারা কোন সময়ে কি কার্য্য তাহা স্থিরীকৃত হয়।
১৭। দেশ-সাধকতা : যাহার দ্বারা কোন স্থানে কি কার্য্য তাহা জানা যায়।
১৮। পাত্র-সাধকতা : যাহার দ্বারা কোন ব্যক্তির সহিত আপন জীবনের কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা জানা যায়।

১৯। পতি-সাধকতা : যাহার দ্বারা স্ত্রীগণ আপন আপন জীবনের সঙ্গীদিগের সুখ সাধনে ও ধর্ম্ম বর্দ্ধনে সক্ষম হয়।
২০। স্ত্রী-সাধকতা : যাহার দ্বারা স্ত্রীদিগের সুখ সাধনা এবং তাহাদিগকে সাধনের সঙ্গিনীকরণে পুরুষ সক্ষম হয়।

এই সকল সাধকতা মনুষ্য হৃদয়ে অপূর্ণভাবে কার্য্য করিতেছে। কালেতে সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগের পরস্পর উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। এই পঞ্চ বিংশতি সাধকতাতে মনোযোগ থাকিলে অমিতব্যয়ীদিগের মিতব্যয়ের ভাব, অত্যাচারীদিগের সদাচার, অপ্রেমিকের প্রেম সঞ্চার, সর্ব্বকার্য্যে পারদর্শিতা এবং ভাব্যভাবনার শেষ ফল– দর্শন ও শ্রবণ যোগের আরম্ভ, অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যেই হইতে পারে।

["প্রকৃত তত্ত্ব"/৪৫]

আরও একটি বিষয় আছে। উহা স্ত্রী ও পুরুষের জন্যই সর্ব্বতোভাবে একান্ত আবশ্যক হইবে। ইহার ভিতর দিয়াই সাধন চলিতে থাকে। ইহাই মূল তত্ত্ব এবং এই তত্ত্ব নিয়াই সকলে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ লাভ করিবে। ইহার নাম অবিষয়। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইয়া 'দয়াময়' নাম লইয়া ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া থাকাই অবিষয়। এই অবিষয় যোগে কার্য্য আরম্ভ কর, অচিরে জগৎ করতলে আসিবেই আসিবে। ইহার অন্যথা করিলে কেহ কখনও শেষ ফল লাভ করিতে পারিবেনা। এই জন্যই শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজের লেখা আছে–

"স্ত্রী ও পুরুষের যোগ সকলের মূল"

এই জগত প্রেমের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, প্রেমেতেই ইহার স্থিতি ও বৃদ্ধি হইতেছে। জগতের রোগ, শোক ও মৃত্যুর কারণ সাধন ভজন ও সাংসারিক কর্ম্মকার্য্য, জ্ঞান ও প্রেম লাভ এবং সকল প্রকারের ঘটনা এই উভয়ের বিশেষ প্রেমযোগের সাধ্য।

সাধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন এই প্রেমযোগের কাঠিন্য দূর হইয়া উভয়কে প্রকৃত প্রেমযোগে মিলিত করিবে তখন- তখনই কেবল স্বর্গের সোপান চক্ষুর সমীপে প্রকাশিত হইবে এবং মনুষ্য সিদ্ধযোগ প্রাপ্ত হইয়া সকল অভাব হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এই বিষয়টি জীবনের পথে অগ্রসর প্রত্যেক ব্যক্তির মনে রাখা আবশ্যক।

[প্রকৃত তত্ত্ব/২২]

দশম অধ্যায়

সর্ব্ব ধর্ম্মের বিশেষ কথা

শ্রীশ্রী আচার্য্য মহারাজ বলিতেন, "আমি এই বাড়ীতেই (কালীকচ্ছ বাড়ীতে) সকল ভাণ্ডার রাখিয়াছি। এই বাড়ীতেই অবতীর্ণ হইয়া আমি তোমাদিগকে দেখা দিব"। মাতৃগর্ভে জন্মিয়া আসিবেন এরূপ কোন কথা বলিয়া যান নাই। তাঁহার সাধন পূর্ণ হইলে তিনি সিদ্ধ দেহে আসিবেন ও জগতের কল্যাণকল্পে সত্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। এমনও তিনি বলিতেন তাঁহার সেই আবির্ভাবকালে দ্রষ্টাদিগের হট্টগোলে অনেকে প্রাণ বিসর্জন করিবে,– কে কার আগে দেখিবে–এই কামনায় বহু লোক পদ-দলিত হইবে; বাস্তবিক লোকের ভীড় এত বাড়িবে। বস্তুতঃ আমরা জানি এই কথাতে অনেকের প্রতীতি হইবেনা। কেননা কোন মৃত মনুষ্য এ পর্য্যন্ত পরলোক হইতে এই মরলোকে ফিরিয়া আসে নাই, আসিতে পারে এমন কথার হেতুও কেহ কোনদিন বলেন নাই। সুতরাং স্বামিজীর বিশেষ ভাবে এই কথা বলিবার কারণ কি, চল অন্বেষণ করি। তিনি স্বীয় জীবনে সত্য ভিন্ন মিথ্যা আচরণ করেন নাই ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি হিন্দু ধর্ম্মেই সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাসী ছিলেন, পরে ব্রাহ্মদের সত্য বুঝিতে পারেন, ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ব্রাহ্ম জীবনেই এই সর্ব্বনাম "দয়াময়" মন্ত্র তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়,– তিনি উহা আনন্দে আশ্রয় করেন। তাঁহাকে কেহ, তাঁহার শেষ জীবনে, এই নাম ছাড়া আর অন্য কোন নামের সাধন করিতে দেখেন নাই এবং তিনিও তাঁহার সহৃদয় বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা কোন শিষ্য-সেবকের নিকট এমন কথা তুলেন নাই। অতএব তাঁহার নিজের চরিত্রগত কাহিনী অনুসরণ করিলেও দেখিতে পাই তাঁহার উক্তি মিথ্যা হইবেনা। তাঁহার সঙ্গীতে লেখা আছে–

ভজ দয়াময় নাম, পূর্ণ কাম হবিরে এই সংসারে, একতাও নামে

হবে, অবতীর্ণ প্রভু এবে, সর্ব্ব জাতি সর্ব্ব প্রেম সর্ব্ব ধর্ম্ম এক করে। মহামন্ত্র এই নাম জীবনে মুক্তির ধাম, সর্ব্বনাম প্রাণারাম মরা মানুষ আসবে ফিরে ॥ সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত– ২য় ভাগ

মানুষ মরিয়া যায়, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব লোপ পায়না। যদি দেহের সাধন পূর্ণ হয়, জগতের যোগে মানুষের মধ্যে সর্ব্বতত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়া যায় এবং মৃত্যুর সাধনে সিদ্ধাবস্থা অধিকারে আসে তবে মৃত্যু হইলেও মানুষ সাধন বলে এ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। সাধন পূর্ণ না হওয়াই মৃত্যুর কারণ বলিয়া গণ্য হয়। সিদ্ধ পুরুষেরা দেহান্তে শিষ্য সেবকের সহিত আলাপ-ব্যবহার করেন ও প্রয়োজন পড়িলে দেখা দেন, ইহার প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নহে। আবার ইহাও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত যে, মানুষের মধ্যে নিহিত যে শক্তি মানুষকে শতবর্ষ পরিমিত কাল জীবিত রাখে, সেই শক্তির পূর্ণ অধিকার জন্মিলে ও ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ যুক্তযোগ উপস্থিত হইলে, কদাপি মানুষ মরিতে পারে না। ঈশ্বর নিত্য ও সত্য স্বরূপেই বিরাজিত আছেন, যিনি অমৃতময় ঈশ্বরে পূর্ণ প্রেম লাভ করিয়াছেন, তিনি জীবন-মরণ শূন্য। মরিলেও সর্ব্ব দৃষ্টির গোচরীভূত হইবেন। বাস্তবিক ইহা সত্য, মিথ্যা হইতে পারে না। শরীর সাধন পূর্ণ হইয়া গেলে মানুষ মরিবেনা। পরলোকেও মানুষ সাধন করিয়া থাকে। এজন্যে মৃত্যুর পরও সাধন দ্বারা মানুষ অমরত্বের অধিকারী হইতে পারে। এই সম্পর্কে শ্রী শ্রী আচার্য্য মহারাজের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল–

২৪শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১২৯১ বাং

মহিষগণঘন্টারব অর্থাৎ মৃত্যুর আগমন সংবাদ মনেতে বড়ই ভয়ের কারণ উপস্থিত করে। আমরা আজ মৃত্যুকে জীবনের মধ্যে আনিব। এই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তে অদ্য উপাসনাতে বসিলাম।

মৃত্যু আর জীবন দুইই এক স্থানেতে কার্য্য করিতেছে। দয়াময়ের চরণের মধ্যে জীবনের যেমন অধিকার, মৃত্যুরও সেইরূপ অধিকার। "মঙ্গলের রাজ্য সম্মুখে দয়াময়" এই ধ্যান কর। "দয়াময় হৃদয়ে জীবনের কার্য্য করিলেন" এই ধ্যান কর। "দয়াময় সারথী হইয়া রথ চালাইতেছেন" এই ধ্যান কর। "রৌদ্র বৃষ্টি সমুদয় আসিয়া দয়াময়কে হৃদয়ে প্রকাশ করিল" এই ধ্যান কর। "মা তুমি মনের সাধন পূর্ণ কর। মদ্র দেশের যোগ আন। যে স্থানে গৃহের অভ্যন্তরে শুভাশুভ জীবনের কার্য্য আছে, এইরূপ ভাব অনুরাগেতে রহিয়াছে। জগতের মধ্যে যত কার্য্য করিতে হইবে, গৃহের মধ্যে তাহার কার্য্য যোগ ও কার্য্য আরম্ভ হয়। গৃহের ভাব পুষ্ট থাকিলে মনের মলিনতা থাকিতে পারেনা এবং কার্য্যের বাধাবিঘ্ন চলিয়া যায়। ব্যাকুলতা যাহার তাহারই সংশোধনী ব্যাপার। দয়াময়ের নাম ভিন্ন হইতে পারে না। এই দয়াময়ের নাম রাজ্য মধ্যে আসিল। একবার দৃঢ় করিয়া এই নাম হৃদয়ে রাখ গৃহের কার্য্য পূর্ণ হইবে। তৎপর জগতেরও সুসার দেখিবে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কলেবরেও তাহা, কলেবরের কার্য্য উপস্থিত হইয়া গৃহের মধ্যে প্রকাশ পায়। আবার গৃহেতে কার্য্য প্রকাশ হইয়া জগতে প্রকাশ পায়। মৃত্যু রোগ শোক শরীর সংশোধক, নাশক নহে। মৃত্যুর জন্য মনের যে ভয় তাহা সিদ্ধ কার্য্য আরম্ভ হইলে বুঝিতে পারিবে। কেবল ঈশ্বর লাভের পূর্ব্ব কার্য্য মাত্র। "মৃত্যু ঘটনা দূর হইল দয়াময় হৃদয়ে আসিল" এই ধ্যান কর।

মৃত্যু চারি প্রকার– বাচনিক মৃত্যু, আধ্যাত্মিক মৃত্যু, সংসার বিচ্ছিন্নতা মৃত্যু, কায়িক মৃত্যু; কায়িক মৃত্যুকেই মানুষ ভয় করে। শরীর ধ্বংস হয় আর দেখা যায় না। কিন্তু শরীর থাকে। যেই বীজ হইতে এই অঙ্কুর সেই বীজেতেই লুক্কায়িত থাকে, বাহিরের চক্ষু দ্বারা কেহ দেখিতে পায় না। এই মৃত্যু নিজ সামীপ্য যোগ দিয়া দয়াময়

পূর্ণ করিবেন। দয়াময়ের দর্শন হইবা মাত্র মৃত্যু দূরে পলায়ন করিবে। "মা তুমি দয়াময়ী তোমার প্রেমে বিগলিত ভাব মৃত্যুকে আনয়ন করে। বিলম্ব সহেনা আর। জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণাভার আর বহিতে পারিনা। এইজন্য শরীর ধ্বংসই প্রার্থনীয়"। এই প্রার্থনার অর্থ এই যে আমার সংসারের অভাব পূর্ণ কর। আমি বাঁচিব আর মরিবনা। এই কথাটি মনের ভাবে আছে। এই ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল? এই ইচ্ছা একজন দুই জনের নয় সর্ব্ব লোকের। যিনি এই ইচ্ছা দিলেন এই ইচ্ছা পূরণ তিনিই করিবেন।" "শিব লিঙ্গ ১০০ হৃদয়ে আসিয়া দয়াময়কে প্রকাশ করিল" এই ধ্যান কর।

বল্লভ, প্রাণ বল্লভ, প্রভু তুমি দয়াময়, এই নামেতে পাপ তাপ, সমস্ত হৃদয়ের অভাব ও বাহিরের অভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। মৃত্যু ভয়ের কারণ থাকিবে কেন? "মৃত্যু হৃদয়ে আসিয়া জীবনরূপ দয়াময়কে প্রকাশ করিল" এই ধ্যান কর। দয়াময় তুমি ॥ ৩। তোমার সত্তা কৈবল্যধাম। এই সত্তার মধ্যে আমরা থাকিয়া নাশ হইয়া যাইব। তোমার নাশ সম্ভব না হইলে ইহা হইতে পারেনা। এই আমিত্ব যোগে তোমার সত্তার পরিচয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে তোমার কার্য্য নহে। তোমার এই সত্তার মধ্যে আমাদের জীবনকে রক্ষা করিতেছে। আমাদের কোন ভয় ভাবনা থাকিতে পারেনা। তোমার সহিত প্রেমযোগে মিলিত হইলে দেখিব তুমি আমি এক হইয়াছি। তখন জীবন কেবলই জীবন মৃত্যু কোথা। তুমি ধন্য।

॥ জয়ধ্বনি ॥

স্বামিজীর গানের সমালোচনাতে অবশ্য উপলব্ধি হইবে জগতে সেদিন অতি নিকটে, যেদিন মৃত মনুষ্য পুনরায় আসিবে ও বন্ধুজনের শোক নিবারণ করিবে এবং মানুষের মধ্যে আর রোগ-শোক-মৃত্যু কার্য্য করিতে পারিবেনা।

বাস্তবিক, তিনিই তাঁহার নিজ জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার জীবনের সর্ব্বশেষ সঙ্গীতটি উদ্ধৃত করিলাম।

মনোহর সাই—একতালা

ভয় নাই আর সংসারে দয়াল নাম সাধরে।
জীবের পরিত্রাণ শুভ বিধান দয়াময় রূপ সাগরে।
মধুর প্রেমের ধন, দয়াময় কর মনন, হৃদয় শুদ্ধ হবে অচিরে,
দেখ যাবে ব্যাধি, হবে সিদ্ধি মৃত্যু ক্ষয় হবে শরীরে।
শিব, শুক নারদাদি পায় নাই কেউ জীবনের বিধি,
বিধি বিষ্ণু সব যম করে,
এখন অবতীর্ণ মৃত্যু শূন্য দয়াময় রাজ্য বিস্তারে।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত- ২য় ভাগ।

নামের সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, জগতে ঈশ্বরেচ্ছাতে দেশকাল ও প্রয়োজন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মুক্তিপথ বাহির হইয়াছে। কিন্তু কোন ধর্ম্মেই প্রকৃত পথ আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাও তাঁহারই ইচ্ছা বলিতে হইবে। এই 'দয়াময়' নাম সর্ব্ব ধর্ম্মের ঐক্যে যোগ দিয়া ঈশ্বর সাধন সম্বন্ধে সকল সংশয় দূর করিবেন। এই অভিপ্রায় জানা যাইতেছে।" কালে এই 'দয়াময়' নামে জগতবাসীর আশা পূর্ণ হইবে। সুতরাং এই 'দয়াময়' নামে মনুষ্য ও দেবতা সকলের মধ্যে পূর্ণ সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইবে। তাঁহার গানে এ ভাব স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।
নীচে এই মর্ম্মে লিখিত একটি গান দেওয়া হইল :-

রাগিনী শঙ্করা-তাল ছপকি

দয়াল নামের মহিমারে পৃথিবীতে হইল প্রচার।
হইল প্রচার মধুর দয়াল নাম।
সত্য সিন্ধু মথিয়া সাধক মহাজন;
পাইল অমূল্য নিধি স্বর্গের সাধন।
জপনের ক্রম আছে দেহের ভিতর;
দর্শন, ধারণ, ধ্যান অতি মনোহর।
ভেষজ অসুর মত যত প্রতিকার;
হইল সকল শেষ কেবল নাম সার।
মৃত্যুশোক আদি যত অসুখ সংসারে;
নামের গুণেতে সব যাইবেক দূরে।
ভয় নাই আর ভাই বল দয়াময়;
জীবন্মুক্ত হবে সবে নামেতে বিজয়।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত-১ম ভাগ

তিনি কেন নিজে দেহত্যাগ করিলেন, ইহার কারণ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব বর্ষের (১৩০৬ বাং) সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার মন্তব্য রহিয়াছে যে, এই দয়াময় নামের মাত্র বারো আনা পরিমাণে সাধন পূর্ণ হইয়াছে, আরও চারি আনা সাধনের যোগ সিদ্ধ হইয়া গেলেই দয়াময় নাম জগতকে সম্যক সাধন দিতে পারিবে।

এইজন্যই মনে করি, তিনি এই নামের উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন ও সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই বলিয়াই প্রয়োজনানুরোধে পরলোকে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধান হইলে তৎ শিষ্য শ্রীমৎ মনোমোহন দত্ত মহাশয় একদিন স্বপ্নে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বাবা

আপনি কেন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন? আপনি না অমরত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন? উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন–মৃত মনুষ্য প্রকাশ করিতেই এখানে আসিয়াছি। এছাড়া সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার তিরোভাবের পরে অনেকে তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছেন এরূপ ভাবের ঘটনা জানিতে পারিয়াছি। স্বামিজীর পুত্র পরম ভক্তিভাজন শ্রীমৎ মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের জীবনেও তাঁহার পূণ্য-প্রতিমা পিতার দর্শন দু'চার বার ঘটিয়াছে। ইহা তাঁহারই মুখে আমরা শুনিয়াছি।

একটি গানে স্বামিজী উল্লেখ করিয়াছেন,– মানুষ এতকাল নানাভাবে সাধন সিদ্ধির উপায় অন্বেষণ করিয়াছে, কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত সাধন পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। নিম্নে সেই গানটি দিলাম–

কত ব্যাস বাল্মীকি ঈশা মুশা, শিব শুক নারদ করি আশা, বান্ধিল সেতু মিটাইতে ধর্ম্ম পিপাসা, মানবকুলের দুঃখ আর ঘুচিল না।

আপদ ভঞ্জন দয়াময় নাম, আইল সকলে করিতে সিদ্ধ কাম; আলোকিত করিয়া হৃদয়ধাম করিবে পূরণ সাধকের সাধনা।

একাদশ অধ্যায়

এ ধর্ম্মে কোন জাতীয়তা নাই

সত্য চিরদিনই সত্য। এই নিমিত্তে কোন ব্যক্তিই জাতিগত পার্থক্য চিরকালের জন্য আবির্ভূত হইয়াছে এমন বলিতে পারেন না। যাঁহারা সিদ্ধ জীবন লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন তাঁহাদের প্রাত্যহিক ও ঐশ্বরিক কার্য্যকলাপের অভ্যন্তরে কোন জাতীয়তা নাই, ইহাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাসের তন্ন তন্ন বিচারেও জানিতে পারা যায় যে, মানবের আদিম অবস্থাতে কোন জাতীয়ভাব কার্য্য করিত না, ক্রমে ক্রমে শ্রেণী বিভাগ উপস্থিত হইয়াছিল। আবার পক্ষান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেদিন আসিতেছে ও যেদিন আসিয়াছে, উভয় কালেই কেহ জাতীয়তা রাখিতে পারিবে না, পারিলেও জীবনের সম্যক স্ফূর্তি হইবে না। এজন্য জাতীয়তার ভাবে কোন নিত্য সত্যের সন্ধান করা সম্ভবপর নহে।

ঈশ্বর মানুষের অন্তরে প্রেমের রাজ্য দিয়াছেন। এই প্রেম ভিন্ন কদাপি কোন ব্যক্তির জীবনে সর্বোচ্চ ধর্ম্মভাব স্থান লাভ করিতে পারে না। জাতিগত পার্থক্য আছে বলিয়াই ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সমাজে সমাজে ঘোর বৈষম্য বিরাজ করিতেছে। কোন কালেই ধর্ম্মে ধর্ম্মে পার্থক্য নাই, ইহা অন্তর্দর্শী মহাজনেরা জানিতে পারেন। যদি জাতিগত বৈষম্য দূরীভূত না হয় তবে সম্পূর্ণভাবে কেহ কাহারো সঙ্গে মিলিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মের মহিমাতেই জাতিগত পার্থক্য ধরাতলে নির্ব্বাণ লাভ করিবে, এই কথা স্বামিজীর ধর্ম্ম গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি ধর্ম্মে ধর্ম্মে পার্থক্য যেমন ভ্রমাত্মক ভাবিতেন, জাতিগত বৈষম্যের মূলেও বাস্তব কোন সত্য থাকিতে পারে না ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, সকলেই চরম সত্যের অধিকারী এবং কেহই মুক্তিফলে বঞ্চিত হইবে না। সুতরাং জাতীয়তা জগতে তিষ্ঠিতে

পারে না।

তিনি নিজের জীবনে জাতীয়তা পরিবর্জন করিয়াছিলেন। সকল শিষ্য সেবকদের লইয়াই তিনি একত্র পান ভোজন করিতেন। হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানাদি কোন সংস্কারেই তিনি বদ্ধ ছিলেন না। মুচির ঘরেও তিনি আহ্লাদের সহিত আহার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সিদ্ধ জীবনের পক্ষে এই ভাব সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইবে; সুতরাং ইহাতে এ ধর্ম্মের বিশেষত্ব কিছুই নাই। কাজেই ধর্ম্মের হিসাবে এ ধর্ম্মে জাতীয়তা নাই এমন কথা বলা যায় না। কারণ এই যে, যে সকল ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত অনেকেই জাতীয়তা মানিতেছেন আর যে সকল নামের মানুষ সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য এবং তাহাদের সমাজ ছাড়িবার অন্য কারণ থাকিতে পারে। বস্তুতঃ এমন কারণ নাই, এমন নহে। তথাপি আমরা যাহাদের সঙ্গে মিশিয়াছি তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই স্বামিজীর বিশেষ প্রিয় পার্শ্বদ ছিলেন, কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে নিয়া দেশভ্রমণও করিয়াছিলেন, ও তাহাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এ সকল ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধুগণের মুখে জানিয়াছি, স্বামিজী কোন কালেই সর্ব্ব ধর্ম্মের মধ্যে জাতীয়তা আছে এরূপ বলেন নাই।

"মলয়া'র সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, শ্রীমত্ মনোমোহন দত্ত মহাশয় নিজে স্বামীজী মহারাজের শিষ্য ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে শত শত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছি, এবং তাঁহাকে এ সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বলিতেন– এ ধর্ম্মে জাতীয়তার কোন নির্দ্দেশ কারণ নাই। বাস্তবিক এ ধর্ম্মের লোকদের মধ্যে যাহারা জাতীয়তা মানিয়া চলিতেছেন, তাহাদের হৃদয়ে, হইতে পারে, এখনও ধর্ম্মের হিসাবে শুদ্ধ ও সর্ব্বাত্মক ভাব বিকশিত হয় নাই, এবং হইলেও উহাতে সমাজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে সাহস বা শক্তি লাভ

করেন নাই। সুতরাং এ ধর্ম্মের হিসাবে জাতীয়তা নাই, ইহা মিথ্যা নহে।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নামের লোকদের চলাফেরা আচার ব্যবহার ও সাধন ভজনে কোন প্রকার জাতীয়তার বন্ধন নাই- সকলের সঙ্গেই সকলে অবাধে মিশিয়া থাকেন। বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছি আমাদের এ ধর্ম্মে জাতীয়তা না থাকিবার অন্য কারণও নিহিত আছে। যিনি এ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহার সাধন প্রণালীতে এবং প্রচার প্রণালীতে জানা যায়, তিনি হিন্দু-মুসলমানাদির কোন প্রভেদ করিতেন না- সকলের জীবনেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগের কার্য্য প্রকাশ করিতে যত্নবান ছিলেন। কোন সময় একজনকে শিব যোগের কার্য্য দিতেন, অপর সময় আবার কৃষ্ণ বীজাত্মক উপাসনা বলিতেন, অন্য সময় সে-ই তাঁহার সমীপে মুশার জীবনের নাম পাইত। এভাবে প্রত্যেকেই সকল নাম সাধন করিবে ও শেষে দয়াময় নাম পাইয়া মুক্তির অধিকারী হইবে। ইহা তাঁহার ধর্ম্মের সার মনে করিতে হইবে।

সত্যই তিনি জাতীয়তা মানিতেন না। তাঁহার কাছে সকল জাতির স্ত্রী ও পুরুষ আসিত, নাম গ্রহণ করিত এবং জীবনের কল্যাণোদ্দেশ্যে তাঁহাকে মানিত। তিনি সকল রকম মানুষের প্রতিই সমদৃষ্টি ছিলেন, সকলকেই স্বীয় মণ্ডলীতে গ্রহণ করিতেন। ইহাতে বুঝা যায় এ ধর্ম্মে কোন জাতীয়তা নাই; সকলেই এ ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারে এবং এক ঈশ্বরের হিসাবে সকলে সকলকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে ভালবাসিতে পারে। সচরাচর আমরাও দেখিতে পাই যে হিন্দুতে মুসলমান; মুসলমানে খ্রীষ্টিয়ান এবং এভাবে ভিন্ন জাতীয় স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রতি প্রেম সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাস্তবিক মনুষ্য প্রকৃতি জাতীয়তার অধীন নহে আধ্যাত্মিকভাবে সকলের সঙ্গেই সকলের প্রেম সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং অধ্যাত্ম যোগেই মানুষের কার্য্য চলিতেছে।

অচিরেই উহা বাহ্য যোগে পরিণত হইবে। সুতরাং সত্য প্রতিষ্ঠাই এ ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষ্য; এজন্য সর্ব্বধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয়তা পোষণ করেন না।

দ্বাদশ অধ্যায়

শেষ কথা বা শান্তির সাধনা

আজ শেষ কথা বলিতেছি। ইহা কি বলা প্রয়োজন। সমাজ সম্পর্কে শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ কি মত পোষণ করিতেন তাহাই এখন বলিতেছি। ১২৯২ সালের ২৪ শে শ্রাবণ তারিখের উপাসনার বিবরণীতে কলিকাতা মোকামে সর্ব্ব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, এই কথা উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও বহু বিষয় তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়– যদ্দারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে, তিনি যে ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহার অনুসরণ করিলে কোনো ব্যক্তিই জাতিগত অথবা নামগত অনৈক্য নিয়া বিরোধ উপস্থিত করিতে পারিবে না, বরং দিনের দিন সাধনার ভিতর দিয়া জগতের স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই আমাদের আপন বলিয়া তাঁহার হৃদয় সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সুতরাং দেখা যায় তাঁহার জাত বিচার ছিল না, সকল ধর্ম্মের লোকই তাঁহার সমীপে সমপরিমাণে প্রিয় ছিল, এবং যদিও তাঁহার মাতাঠাকুরাণী হিন্দু-বিধবার জীবন যাপন করিতেন, তথাপি তিনি এ সম্বন্ধে অনুমাত্র ওজর আপত্তিও করিতেন না। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধু বিয়োগের পর শ্রাদ্ধাদি (অনুষ্ঠান) অপ্রয়োজনীয়, কারণ ইহা দ্বারা মৃত ব্যক্তির জীবন মুক্তির আশা দূরীভূত হইয়া যায়। আরও তাঁহার উপদেশ আছে যে, যে যে প্রকারের বিবাহ প্রথা পৃথিবীর নানা জাতি বা সম্প্রদায়ে প্রচলিত রহিয়াছে, তৎ সমস্তই বাহ্যিক ব্যাপারকে অনেক পরিমাণে লক্ষ্য করে এবং তদ্দারা কাহারো কোন প্রকারের জীবন্মুক্তির কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। অতএব ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত যে, পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত “প্রকৃত বিবাহ” হয় নাই কারণ যে আন্তরিক ঐক্য দ্বারা দুই শরীর এক হয় এবং সংসার ও স্বর্গ একত্র মিলিত হয় তাহারই নাম বিবাহ। সুতরাং এই “প্রকৃত বিবাহ” নিয়া সমাজ গঠিত হইবে,

ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হইবে এবং প্রতি মানব ও মানবী কিংবা স্ত্রী ও পুরুষ সর্ব্বধর্ম্মানুসারে শেষ ফল লাভ করিতে পারিবে।

এই বিবাহ যোগ লাভ না করিলে কেহই রোগ-শোক-মৃত্যু নিবারণ করিতে পারিবে না। এইজন্যই বলা যাইতে পারে, মানবগণ সফল মনোরথ হইবার নিমিত্ত সকলেই এই বিবাহ যোগ লাভ করিবে।

যে সমাজের প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ উক্ত বিবাহ যোগ লাভের জন্য কার্য্য করিবে ও নিজ নিজ আদর্শ স্ত্রী বা পতি পাইবার উদ্দেশ্যে সাধন করিতে সর্ব্বস্ব পণ করিতে পারিবে, সেই সমাজের নামই সর্ব্ব সমাজ হইবে। এই সমাজের মধ্যে সকল স্ত্রী পুরুষই কেবল ঈশ্বর প্রাপ্তির নিমিত্ত দিনরাত্রি কার্য্য করিবে এবং জীবিকার অন্বেষণ করিতে গিয়াও সেই জীবন্মুক্তির কার্য্যই আদর্শ বলিয়া গণ্য করিবে। সুতরাং সে সমাজের মধ্যে নামের কার্য্যই একমাত্র অবলম্বন হইবে ও সকল প্রতিকারই দয়াময় নামে নিবেশিত জানিয়া প্রাণ-মন এই নাম সাধনে অর্পণ করিবে।

একটি সাধন ব্যাপার এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। উহা এই যে, ধর্ম্ম জীবনের মধ্যে যাহা কিছু আমরা লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা কি? ইহার পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। যে যাহাই ধারণা করুন না কেন, আমরা শান্তি চাহিতেছি, এই শান্তির উদ্দেশ্যেই সকলে কার্য্য করিয়া থাকে। এই শান্তি আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে নাই। এজন্য বলিতেছি যে, দয়াময় নাম নিয়া কার্য্য করিলেই এই চরম শান্তি আসিবে এবং সর্ব্ব কালের জন্য সকল প্রকারে সাধনার চরমোৎকর্ষ সংসাধিত হইবে। এমন কি এই নামে জগত দীক্ষিত হইবে এবং এই নাম একভাবে সকলের হৃদয়কে অধিকার করিবে। সুতরাং এ কারণেই সকল সমাজ নিয়া যে সমাজ, সকল ধর্ম্ম নিয়া যে সমাজ

এবং সকল জাতি নিয়া যে সমাজ তার নামই সর্ব্বসমাজ। এই সমাজের জন্য আজ এই উক্তিই সমীচীন যে, আমাদের যা কিছু কর্ম্ম এবং সাধন ভজন সেই সমাজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তই করা হইবে।

আজ যদি আরো কোন বিষয়ের মীমাংসা করা আবশ্যক হইয়া থাকে উহা কি হইবে নির্দ্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। আমার হিসাবে বুঝিতেছি যে, আর অন্য কিছুই আলোচনা করিবার দরকার নাই, শুধু একটি অতি সাধারণ বিষয়ে মীমাংসা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহা নিয়াও আমাদের অন্তরে অসংখ্য উৎপাত উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ বলিবেন পতি এবং স্ত্রী এই উভয়ের মধ্যে পতিই স্ত্রীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে; অন্যদিকে অনেকে তাহার বিপরীত উক্তিই করিয়া থাকেন। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে "স্ত্রী বড় না পতি বড়" ইহাই চিন্তার বিষয় হইতেছে। এ সম্বন্ধে একটি জটিল প্রশ্ন আছে। ইহা এই যে, যখন দুইজন স্ত্রী ও পুরুষ প্রকৃত বিবাহ সূত্রে গ্রথিত হইবে ও উভয়ের মধ্যে সিদ্ধযোগ প্রকাশিত হইবে; তখন তাহাদের মধ্যে কিরূপ অবস্থার সমুদ্ভব হইবে, ইহা জানিতে হইবে। অতএব বড়-ছোট প্রশ্ন না করিয়া বিবাহ সম্পদ কিরূপ বস্তু তাহাই এখন জানিয়া লইতে সচেষ্ট হইব। যে আন্তরিক ঐক্য দ্বারা দুই শরীর এক হয় এবং সংসার ও স্বর্গ একত্র মিলিত হয়, তাহারই নাম বিবাহ। এরূপ জীবন লাভ করিতে পারিলে বড়-ছোট প্রশ্নই তখন থাকিতে পারেনা– ইহাই দেখা যাইতেছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, ঈদৃশ অবস্থা না পাওয়া পর্য্যন্ত "পতি বড় না স্ত্রী বড়" এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। ইহারও উত্তর প্রকৃত তত্ত্বে রহিয়াছে। "স্ত্রী সাধকতা ও পতি সাধকতা" ব্যাখ্যা সম্পর্কে যে উক্তি বর্ণিত আছে তদ্বারাই উক্ত প্রশ্নের সুমীমাংসা হইতে পারে। কারণ উক্ত বর্ণনা হিসাবে বুঝিতে পারা যায় যে পতি সাধকতার দ্বারা স্ত্রীগণ আপন আপন জীবনের সঙ্গীদিগের সুখ সাধনে ও ধর্ম্ম বর্দ্ধনে সক্ষম হয় এবং

স্ত্রী সাধকতা দ্বারা স্ত্রীদিগের সুখ সাধনা এবং তাহাদিগকে সাধনের সঙ্গিনীকরণে পুরুষ সক্ষম হয়; সুতরাং অতি স্পষ্ট কথায় ইহাই বলিতে পারা যায় যে, স্ত্রীই পতির অনুগামিনী হইবে। 'স্ত্রী সাধকতা ও পতি সাধকতা'র কার্য্য লাভ করাও সহজ ব্যাপার নহে। আমিত্বের যোজনা হেতুই আমাদের অন্তরে পতি বা স্ত্রী এই বোধ বা সংস্কার জন্মে। কাজেই উপরিউক্ত সাধকতা যাহার মধ্যে আবির্ভূত হইবে, তাহার মধ্যে ভেদ বুদ্ধির কার্য্য থাকিতে পারিবে না। সুতরাং জীবন পথে অগ্রসর হইলে বড়-ছোট এই প্রশ্ন কেহই করিতে পারে না।

কিন্তু আসল বিষয় এই যে, উক্ত অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে আমাদের আমিত্ব থাকিবেই, এবং আমরাও উক্ত সাধকতার কার্য্য লাভের জন্যই নামাদি সাধন করিতে থাকিব।

অতএব কে কাহাকে মানিয়া কার্য্য করিবে এ সম্বন্ধেও "সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী" নামক গ্রন্থে উত্তর আছে। তাহাতে জানা যায় যে, মহাসংকীর্ত্তন চারি প্রকার। তন্মধ্যে গৃহ পতির সেবা ও গৃহপত্নীর প্রেমরস আস্বাদন একটি মহাসংকীর্ত্তন। এই উক্তির চিন্তা দ্বারাও ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, গৃহপত্নীই গৃহপতির অনুগমন করিবে ও তাহার প্রীতির জন্য কার্য্য করিবে।

অতএব শেষ কথা এই যে, শান্তিই সাধনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই শান্তি সাধন না করিয়া কেহই পাইতে পারে না। এই সাধন আবার দয়াময় নামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া করিতে হইবে। দয়াময় নামে দীক্ষা লইলেও চলিবে না, কিন্তু পতি ও পত্নী উভয়ে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে আবার স্ত্রী গৃহপতির সেবা করিবে এবং পতি গৃহপত্নীর প্রেম রসাস্বাদন করিবে। এইরূপে যখন উভয়ে সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইয়া দয়াময় নাম লইয়া ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া থাকিতে পারিবে তখনই অবিষয় যোগ উপস্থিত হইবে। এই অবিষয় যোগে কার্য্য

করিতে করিতেই জগত করতলে আসিবে ও পূর্ণ সিদ্ধ অবস্থা আবির্ভূত হইবে।

গীত

বেহাগ-পোস্ত

আজীবন রাজ্য সুখ দেও আমারে কমল লোচন,
কে আছে তোমা ছাড়া করিবে দুঃখ ভঞ্জন ॥
বিকার বিষয় বুদ্ধি, নাশ করে সর্ব্ব শুদ্ধি,
অনুকূল প্রতিবাদী রেখ না আর অকারণ ॥
বিরক্ত হইয়া ফিরি; রাখি আপন পাশরি
তোমাকে হৃদয়ে হরি, করুণার ছবি এখন ॥
কি কাজ আর সংসারে, তুমি আমার হৃদয় দ্বারে,
অনুকূল প্রতি দ্বারে তব মুখকেলি যখন ॥

সর্ব্বধর্ম্ম গীত- ২য় ভাগ

০

শ্রী আনন্দের বাণী

১। দয়াময় নাম হৃদয়ে রাখ আর অশুভ নাই।

২। সর্ব্বসময়ে নামের যোগ হৃদয়ে রাখা– ইহারই নাম সময় সাধন।

৪। দয়াময়ের অধীন হইলেই পূর্ণ স্বাধীনতা আসিল।

৫। দয়াময়ের নাম পূর্ণ। এই নাম যখন আমাদের হৃদয়স্থ আছে তখন আমরা দয়াময়কেই লাভ করিয়াছি। কেননা নামেতে তাঁহাতে অভেদ।

৬। আমরা দয়াময়কে ডাকি একথা অগ্রাহ্য; কেননা দয়াময় যখন আমাদিগকে ডাকিতে অবকাশ দেন কেবল তখনি আমরা ডাকিতে পারি।

৭। মানের গৌরব যাহাদের মনে আছে, তাহারা কখনো দয়াময়ের শরণাপন্ন হইতে পারে না।

৮। কেবল উপাসনায় ব্যস্ত হইয়া বসিয়া থাকিব, কার্য্যেতে কর্ম্মেতে উপাসনা আছে বুঝিব না ইহা হইতে পারে না।

৯। সংসার বাসনা থাকিতে কেহ সাধন করে না ও করিতে পারে না। এই বাসনা সাধন সিদ্ধির বাধক।

১০। আমি দয়াময় নামেতে তোমাদের উন্নতি সাধন করিব ইহা দয়াময়ের বাণী।

১১। মৃত্যু, রোগ, শোক শরীর সংশোধক, নাশক নহে। মৃত্যু কেবল ঈশ্বর লাভের পূর্ব্ব কার্য্য।

১২। রোগ শোক মঙ্গলের কার্য্য করিতেছে।

১৩। শরীর ধ্বংস হয় আর দেখা যায় না, কিন্তু শরীর থাকে। যেই বীজ হইতে অঙ্কুর সেই বীজেতে লুক্কায়িত থাকে। বাহিরের চক্ষু দ্বারা কেহ দেখিতে পায় না। তোমার সহিত প্রেম যোগে মিলিত হইলে দেখিব তুমি আমি এক হইয়াছি। তখন জীবন কেবলই জীবন , মৃত্যু কোথায়?

১৪। প্রসন্নতাই সিদ্ধি যোগ।

১৫। মনের আনন্দে নৃত্য কর, দয়াময় নাম সার কর, সকল সাধ্য সাধন পূর্ণ হইবে।

১৬। তোমরা মৃত দেহ লইয়া আর থাকিও না। কার্য্য কর্ম্মের ভাব বিশেষ রূপে যে শরীরে নাই সেই শরীরই মৃত শরীর।

১৭। তুমি যদি কর কৃপা থাকে না আর মৃত্যু ভয়। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকলই তোমা হইতে অন্ধকার।

১৮। আমরা কি করি জানিনা- কেবলই দয়াময়ের ইচ্ছার অনুগামী হইয়া কার্য্য করি।

১৯। জগত প্রতি মুহূর্তেই উন্নতি লাভ করিতেছে। একদিনের পর আর একদিন উত্তম।

২০। যদি মানসিক চিন্তা মনকে অস্থির করে তবে দয়াময় স্মরণ মনন ব্যতিত আর কিছুতেই শান্তি হইতে পারে না।

২১। সম্পদ বিপদের মধ্যে আছে।

শ্রী আনন্দের বাণী

২২। পিতা-মাতার প্রেমের ধন সন্তান, উভয়ের প্রেমে শিথিল ভাব হইলে সন্তানের অমঙ্গল হয়।

২৩। দয়াময় স্ত্রীলোকদিগকে বলিলেন, “তোমরা গৃহকার্য্য করিয়া অবসর পাওনা বলিয়া তোমাদিগকে সহজ সাধনে পার হইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা স্বামী পুত্রের সেবা কর। কোন বিপদ দেখিলে দয়াময়কে স্মরণ করিও, বিপদ দূর হইয়া যাইবে।

২৪। নানা প্রকার ভাবের একত্র মিলনের নাম শঙ্কর যোগ। এই শঙ্কর যোগ ব্যতীত সাধন সিদ্ধি হইতে পারে না। জগতে যত প্রকার ভাব আছে একটি বাকী থাকিলেও শঙ্কর যোগ পূর্ণ হইতে পারে না।

২৫। আরাধনা, প্রার্থনা ও ধ্যান সকলই অকর্মণ্য; যদি দয়াময় হৃদয়ে আবির্ভূত বলিয়া বুঝা না যায়।

২৬। মাতৃভাব স্ত্রীর মধ্যে আছে। আমি মরি তুমি বাঁচ এই কথা স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ বলিতে সাহস করে না।

২৭। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেই ঈশ্বর চিন্তা করিয়াছেন–শাস্ত্রে এই কথা আছে। যে ব্যক্তি অন্যের পূজা করে সে কখনো ঈশ্বর হইতে পারে না। জ্ঞানের চক্ষুতে দেখিতে গেলে জগতকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। অতএব যাহার মধ্যে জগত দেখিতে পাও তাহাকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে।

২৮। অসুরদিগের প্রতি লোকের সদ্ভাব নাই অথচ অসুর প্রকৃতি হৃদয়ে আছে।

২৯। তোমরা যদি আমাকে তোমাদের গৃহের অভ্যন্তরে আছি বলিয়া জান তবে তোমাদের সর্ব্ব দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যাইবে।

৩০। কৃষ্ণ সর্ব্বদাই ব্রহ্ম মন্দিরে উপস্থিত থাকেন। সকল প্রেম একদিন কৃষ্ণ নামেতে ছিল। আজ অর্দ্ধযোগ আছে।

৩১। বিষয়-লালসা, জিতেন্দ্রিয় ভাব মনেতে মালিন্য সঞ্চার করে। তুমি তোমার শরীর মনের কার্য্য কর না। তোমার কার্য্য ঈশ্বর করিতেছেন- তাঁহাতে অনিষ্টাশঙ্কা করা তাঁহাকে অবিশ্বাস করা হয়। তোমরা তোমাদের চেষ্টা খাটাইতে মনে করিও না। নিজের চেষ্টায় কিছুই হয় না। তাঁহাতে নির্ভর কর।

৩২। মশক গলকরন্ধ্রে হস্তীযুথ প্রবিষ্টঃ। ইহা সাধকদিগের অবিশ্বাস্য নহে।

৩৩। তোমরা সংসারে থাকিয়া স্বর্গ লাভ করিবেই করিবে। দয়াময় পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেছেন।

৩৪। যদি চাও আজ কেবল মঙ্গল তবে অর্দ্ধযোগ লাভ হইবে, এজন্য মঙ্গল এবং অমঙ্গল উভয়কেই হৃদয়ে গ্রহণ করিতে হইবে।

৩৫। তোমরা বিশেষভাবে প্রস্তুত হও যেন জগতের কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য মনে না থাকে।

৩৬। গৃহেতে প্রেম সকল সম্পদের মূল।

৩৭। মানস প্রতিমা- স্ত্রীরূপ সাধন।

৩৮। জগতের সেবা করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়া স্বার্থ ত্যাগ করাই পূর্ণ সাধন।

৩৯। যেখানে পিতামাতার পূর্ণ অধিকার সেখানে পুত্র কন্যার অসাধ্য কি আছে? মনে রাখ যিনি মহারাজা বিশ্বময় প্রজা, জাননারে মন তুমি পুত্র তাঁর।

৪০। প্রার্থনার ফল দাতা আমি, কিন্তু তোমাদের মুখে প্রার্থনা না করাইয়া ফল দান করিতে পারি না–এই আমার নির্দিষ্ট নিয়ম।

৪১। যদি তোমরা খাঁটি কথা চাও তবে শুন– কিছুই যাইবেনা; কেবল ভাবেতে চিন্তাতে সংসার থাকিবেনা, এইমাত্র। চিন্তাতে না থাকিলে কার্য্যেতেও থাকিবেনা, এই কথা বলা যায় না। কার্য্য কর্ম্ম সকলই থাকিবে। আহারীয় পানীয় সকলই প্রয়োজন। তাহার জন্য যাহার চিন্তার আবশ্যক সে চিন্তা করিবে। তোমাদের কেবল শ্রীচরণ চিন্তা।

৪২। দয়াময় বলিলেন, তোমরা আমাকে হৃদয়ে গ্রহণ কর। তবে সকল শান্তি তোমাদের আসিবে ও আশা পূর্ণ হইবে।

৪৩। ভাই ভগিনী বন্ধু বান্ধব সকলে চল হে একবার সাধ্য সাধন পূর্ণ করিবার জন্য দয়াময় সমীপে প্রার্থনা করি।

৪৪। দয়াময় বলিতেছেন, শোন আমার সকল ভাণ্ডার এই বাটীতে রাখিয়াছি। এই বাটীতে আমি অবতীর্ণ হইয়া তোমাদিগকে দেখা দিব।

৪৫। দয়াময় নাম জপ করিলে পূর্ণ প্রেম পাইবে। এই নামেতে একতা, শান্তি, পরিত্রাণ লাভ করিবে।

৪৬। দুঃখ সুখের ভিত্তি ভূমি

৪৭। নানা প্রকার ভাবের একত্র মিলনের নাম শংকর যোগ। এই শংকর যোগ ব্যতীত সাধন সিদ্ধি হইতে পারে না। জগতে যত প্রকার ভাব আছে একটি বাকী থাকিলেও শংকর যোগ পূর্ণ হইতে পারে না।

৪৮। তোমাদের সুখ সম্পদ এই হৃদয়ে, যদি মনের কৈতব রাখ তবে শরৎকালের জ্যোৎস্না পাইবে না।

৪৯। হৃদয়ে সরল ভাবে তাঁহাকে বন্ধু বিশ্বাস ও তাহাতে আত্ম সমর্পণ পূর্বক জীবনের সমুদয় ভাব তাহাতে অর্পণ করা ও তাহার হওয়ার নিমিত্ত তাহার নিকট যে প্রার্থনা তাহাই প্রকৃত উপাসনা।

৫০। প্রোথিত ধনরাশি যেমন মনকে সর্ব্বদাই আশা দেয়, সেই প্রকার দয়াময় নাম জীবের দুঃখ ক্লেশ নিবারণ করিবে, এই আশা সতত মনে উদয় হইতেছে।

৫১। ভগিরথ গঙ্গা আনিয়া যেমন পূর্ব্ব পুরুষদিগকে উদ্ধার করিলেন, পুরাণে লিখা আছে সেইরূপ আজ দয়াময় নাম সুধা পানকারী সকল ভক্তমণ্ডলী আপন আপন পূর্ব্ব পুরুষদিগকে উদ্ধার করিবেন। বংশের প্রদীপ দয়াময় নাম যাচক লোক।

৫২। জীবন দয়াময়ের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র শঙ্কট নিবারণের কার্য্য।

শ্রী আনন্দের বাণী

৫৩। প্রেম বড় মধুর। প্রেম ছাড়া নাম কার্য্য করেনা। প্রেমে সংসার স্বর্গে পরিণত হয়। প্রেম সমুদ্রের ন্যায় অসীম অনন্ত। নাম ও প্রেম এক। বিরহ ও মিলন এক না হইলে প্রেম পূর্ণ হইতে পারে না।

৫৪। শিব সর্ব্বদা শক্তি সাধন দ্বারা উন্নত হইয়াছিলেন। দুর্গা এবং কালী এই দুইরূপে জগতে শক্তি পূর্ণ রহিয়াছে। এই দুই রূপকে আদর কর।

৫৫। স্থির ভাব হৃদয়ে রক্ষা করা এবং লক্ষ্যের দিকে সতত গমনোন্মুখ থাকা আমাদের প্রয়োজন। ধ্যান যোগ মোক্ষ যোগ।

৫৬। গৃহের জঞ্জাল ও বনের শ্বাপদ অসাধিত হৃদয়ের জন্য উভয়ই তুল্য প্রতিবন্ধক।

৫৭। প্রত্যেক বস্তু এক মূল হইতে উৎপন্ন। ভিন্ন ভিন্ন আকার ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ একেরেই বিচিত্র ভাব মাত্র। সকল প্রকারের কার্য্যই মানুষকে সেই দিকে লইয়া যাইতেছে।

৫৮। একটি মনুষ্যতে জগতের যেমন ছায়া আছে, একটি পরমাণুতেও তেমনি জগতের যোগ রহিয়াছে।

৫৯। জল পান করিলে যেমন পিপাসার নিবৃত্তি হয় সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগে আমি যে বস্তু দ্বারা গঠিত, সেই বস্তুময় হইবার জন্য মনের ব্যাকুলতার জন্য যে প্রার্থনার উদয় হয়, তাহাই উপাসনা।

৬০। তোমরা বিশেষভাবে প্রস্তুত হও, যেন জগতের কার্য্য ভিন্ন আর কোন কার্য্য মনে না থাকে।

৬১। কলিযুগে সাধন প্রাপ্তির তিনটি উপায় প্রধান যথা : (১) মনসাযোগে "রাম, কৃষ্ণ ও হরি" নাম (২) মহাযোগে "হরি ওঁ দয়াময়" নাম এবং (৩) শেষযোগে "বাধাবিঘ্ন জয় দয়াময়" নাম। কিন্তু কোন উপায়েই সাধনের পথ নিকট হইল না। এজন্য এখন কেবল 'দয়াময়'– এই নামই সর্ব্ব সংকল্প সিদ্ধ করিবার জন্য জগতে আসিল।

৬২। ঈশ্বর নিজ হস্তে যাহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অচেতন– জড় একটি মূর্তিকে কখনই শ্রেষ্ঠ মনে করা যাইতে পারে না। মৃত্তিকার কোন মূর্তিকে ভ্রম না হইলে কেহ প্রেমে আলিঙ্গন করিতে পারে না। বাস্তবিক, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, পতি-পত্নী প্রভৃতিই পূজার সাকার মূর্তি।

৬৩। শুদ্ধ বিবাহ না হইলে ভ্রমান্ধতা দূর হইতে পারে না; কিন্তু শুদ্ধ বিবাহ করিতে মন তত ব্যগ্র হয় না, কেননা, তাহাতে আবার ঈশ্বরকে লইয়া কার্য্য করিতে হয়।

৬৪। জীবন মুক্তির অর্থ কী?
উত্তর : অনন্তকাল এই শরীরে পূর্ণ শান্তি ভোগ করার নাম জীবন মুক্তি। অন্য প্রকার, দেহ আত্মার একতার নাম জীবন মুক্তি অর্থাৎ শরীরের সহিত পরমাত্মার ঐক্য হওয়ার নাম মুক্তি। ব্রহ্ম ও আত্মা এক। যখন ব্রহ্ম শরীরধারী হয় তখন তাহাকে আত্মা বা শরীর বলে। যখন অশরীরি মনে হয় তখন তাহাকে পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্ম বলে। ইহারই নাম বিশুদ্ধ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি।

৬৫। জগত এক ঈশ্বরের ক্রোড়ে আছে ও তাঁহার দিকেই চলিয়া যাইতেছে। আত্মাময় জগত পরমাত্মার সহিত যুক্ত না হইলে কীরূপে জীবন রাখিতে পারিবে? অতএব একমাত্র ঈশ্বরই জগতের আদর্শ।

৬৬। জগতের হিত কার্য্য করাই ধর্ম্ম। এক আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও আত্মা ব্যতিত জগতে আর কিছুই নাই। এই কথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম কর ও জগতের সেবাতে নিযুক্ত হও, তবেই প্রকৃত ধর্ম্মালাভ হইবে।

৬৭। মানুষের সাধন পূর্ণ হইতেছে না, কারণ মানুষ জীবনোপায়ের জন্য যাহা করিয়া থাকে, তাহা ঈশ্বরকে অর্পণ করিতে পারে না। জীবন ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করাই মানুষের সঙ্কট নিবারণের একমাত্র কার্য্য। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয়ের মধ্যে মানুষের প্রেম আছে, সেই সকল বিষয়ই ঈশ্বর– এই কথা মনে রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই আত্ম সমর্পণের কার্য্য হইয়া যাইবে।

৬৮। যেকাল পর্য্যন্ত মানুষকে দোষী ও গুণী বলিয়া মনে ধারণা থাকিবে ততকাল জগতে ঐক্য বন্ধন অসম্ভব। সে দিন আসিতেছে যে দিনে অদ্বৈত ভাবাপন্ন জ্ঞানী মানুষের চীৎকারধ্বনি সফলতা লাভ করিবে। অদ্বৈতভাব ব্যতীত আর কোন প্রকারেই মানুষের প্রতি মানুষের মন্দভাব দূর হইতে পারে না।

৬৯। কোন ধর্ম্মাবলম্বী বিপথগামী নহে।

৭০। যিনি সঙ্গিনী বা সঙ্গীকে বশীভূত করিয়া সাধনের মধ্যে আনিতে না পারেন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে তিনি তাহার নিকটে বসিয়া নাম জপাদি করেন ও তাহার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা বিশেষ প্রার্থনা করেন। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তাহার মন ফিরিয়া সাধনের দিকে আসিতে থাকিবে।

৭১। সকল নামের যোগ একটি নামেতে আছে– সেই নাম 'দয়াময়'। যাহা সদয় নিদয় উভয়ভাবে ভক্ত হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকারী ব্যক্তি ইহা হৃদয়ে বুঝিতে পারিবেন।

৭২। মনে শান্তি লাভ করাই সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল, তাহা সর্ব্বতোভাবে সন্দেহ নিরাকৃত না হইলে হইতে পারে না। নানা প্রকার মত ও মনের ভাবের মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য এই ঈশ্বরেতে যোগ-শেষের অবস্থা শীঘ্র লাভ করিতে পারে না।

৭৩। সাধনের কার্য্য আরম্ভে কল্পনা, আসন, বসন, তীর্থভ্রমন, শ্মশানাদিতে জপ, মুদ্রা, পূজা, প্রচারাদি এবং ভক্তগণের যোগাদি নানা প্রকার কার্য্য অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারাই হিন্দুদিগের মধ্যে সিদ্ধির কথাও শুনা যায়, কিন্তু এই আংশিক সিদ্ধি দ্বারা জগতের বিশেষ উপকার হইতে পারে না ও তাহা অচিরকাল মধ্যেই অবসন্ন হইয়া যায় এবং জগতে আন্দোলন মাত্র রাখিয়া জীবন শেষ হইয়া যায়। জগতের যোগ না করিলে কোন প্রকারেই প্রকৃত সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। কোন প্রকারের ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই প্রকৃত সিদ্ধির পথ আবিষ্কৃত হয় নাই।

৭৪। যে আন্তরিক ঐক্য দ্বারা দুই শরীর এক হয় ও সংসার এবং স্বর্গ এক স্থানে মিলিত হয় তাহারই নাম বিবাহ। বিবাহ কার্য্যে ব্যত্যয় ঘটাতেই পৃথিবী রোগ, শোক ও মৃত্যুর বিষময় ফল প্রসব করিতেছে।

৭৫। বাস্তবিক কেহই অদ্যাপি জীবনমুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এমন সময় শীঘ্রই আসিবে, যখন ঈশ্বর মানবগণ সফল মনোরথ হওয়ার জন্য প্রকৃত বিবাহযোগ পৃথিবীতে আনিয়া দিবেন ও পরমানন্দ লাভে কৃতার্থ করিবেন।

৭৬। শরীর ও আত্মার ভাব ও কার্য্যের ঐক্য-ভাবের নাম মুক্তি। যদিচ শরীর ও আত্মা একই এবং ব্রহ্মভূত পদার্থ তথাপি এ উভয়ের ভাব ও কার্য্যে বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রভেদ চলিয়া গিয়া যখন একতার কার্য্য হইবে, তখনই বিকার শূন্য হইয়া মন আনন্দময় হইবে ও মানুষ মুক্তি লাভ করিবে।

৭৭। সর্ব্ব প্রকারের পার্থক্য পরিত্যাগ করিয়া সকলেই নাম যোগ সাধন করিলে অমরত্বের যোগে জগতে একতা আসিবে ও ধর্ম্ম মতের আর অনৈক্য থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর এবং তাঁহার নাম এক এবং একই; এ উভয়ের কোন পার্থক্য নাই। ঈশ্বরেতে যাহা আছে তাঁহার নামেও তাহা আছে, ইহাতে স্থির বিশ্বাস হইলে অন্য প্রকার সাধনের কোন আবশ্যক থাকে না। এই নাম-যোগের পর ধ্যানযোগ লাভ করিয়া মনুষ্য শরীর সাধন পূর্ব্বক রোগ, শোক ও মৃত্যু হইতে নির্ভয় ও জীবনমুক্ত হইবে।